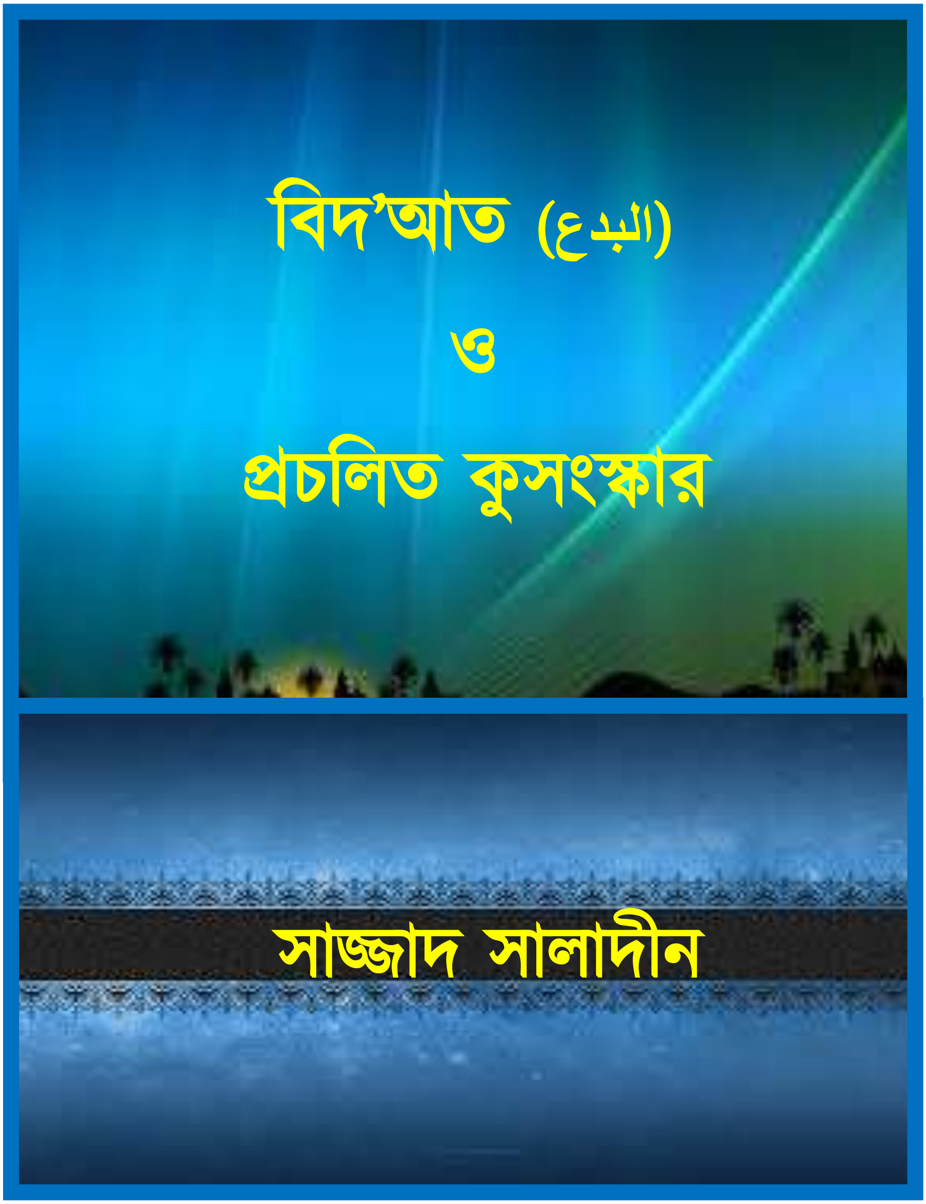

http://islaminonesite.wordpress.com

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রারম্ভিকা	০৫
০২	বিদ'আতের সংজ্ঞা	১৬
০৩	বিদ'আতের বৈশিষ্ট্য	২৯
০৪	দ্বীনের ভিতর বিদ'আতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?	৩২
০৫	বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ	৪৮
০৬	বিদ'আতের অপকারিতা	৭২
০৭	আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার	৮৬
০৮	শবে মেরাজ রাত্রি উদযাপন করা	৯০
০৯	মাহে শাবান ও শবে বরাত (شب براءت) করণীয় ও বর্জণীয়	৯২
১০	শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্ফিল এবং কিয়াম – নব আবিষ্কৃত বিদ'আত	১৭০
১১	মীলাদে কিয়াম করা প্রসংঙ্গ	১৯০
১২	বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আত	২১৩
১৩	নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা	২২৫
১৪	ফরজ নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা	২২৭
১৫	উচ্চে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা	২৩১
১৬	মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ'আত	২৩২
১৭	জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাত	২৪১
১৮	কুলখানি বা চল্লিশা পালন	২৪২
১৯	মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা	২৪৩
২০	রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আত	২৪৫
২১	কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ'আত	২৪৮
২২	কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কুরআন পাঠ	২৪৯

http://islaminonesite.wordpress.com

২৩	তথাকথিত পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব উৎকৃষ্ট বিদ'আত	২৫৩
২৪	ওরস	২৫৪
২৫	ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাত - একটি প্রচলিত বিদ'আত	২৫৭
২৬	শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা	২৫৯
২৭	প্রচলিত তাবলীগ এবং চিল্লা প্রথা	২৬১
২৮	ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা	২৭৯
২৯	জামাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা প্রচলিত বিদ'আত	২৮৩
৩০	জোরে আমীন না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আত	২৮৯
৩১	হজ্বের বিদ'আতসমূহ	৩০০
৩২	অন্যান্য বিদ'আতী কাজ এবং সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার সমূহ	৩১০
৩৩	বিদাতীর পরিচয়, বিদ'আতী চেনার উপায়, বিদাতীর কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি, বিদ'আতের ভয়াবহতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	৩২৭
৩৪	বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন	৩৩৮
৩৫	দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	৩৪৬
৩৬	বিদ'আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান	৩৪৮
৩৭	উপসংহার	৩৫০

http://islaminonesite.wordpress.com

লেখকের বক্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

[(وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيم ا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣) [الانعام: ١٥٣

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ গুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"।

শুধু তাই নয় আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন, আজ তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে"। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে জানিয়ে দেন, তিনি রাসূল (صلى الله عليه وسلم) - এর মৃত্যুর পূর্বেই দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে পূর্ণতা দান করার পর দীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ানোর কোন অবকাশ নাই। অথচ আজকাল আমাদের দেশে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে যে সকল বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছে এবং একাকার হয়ে আছে তা দূর করার লক্ষেই অমার এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি। অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক সেই প্রত্যাশা ও দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সেই দোয়া কুবল কুরন, আমীন।

তাছাড়া যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ান বা কমান তার অর্থ হল আল্লাহ দীনকে পূর্ণতা দান করেননি। দীনকে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট কাজের জন্য কোন মাখলুককে দায়িত্ব বা অধিকার দিয়েছেন? অথচ আজকাল মাযহাবপন্থীরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিরোধী যাল ও যঈফ হাদীসের উপর আমল করে এবং প্রচলিত বানোয়াট বিদ'আতী ও কুসংস্কারযুক্ত রসম অনুসরন করা থেকে যেন বিরত থাকে এবং আমার লিখিত গ্রন্থটি পড়ে যেন সকল মুসলিম উম্মাহ এবং নামধারী মুসলিম উম্মাহরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং এই অধমের লেখনীর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

অধিকন্তু এই গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব গ্রন্থের সহয়াতা নিয়েছি তা ফুটনোট আকারে গ্রন্থটিতে সংযোজন করেছি। তাছাড়া যেসব দ্বীনি ভাই ও বোন এই গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হে আল্লাহ আপনি তাঁদেরকে যাযাকাল্লাহ খায়ের দান করুন, আমীন।

সর্বশেষে আমি মানুষ। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর একটি হাদীস না উল্লেখ করলেই নয়। তিনি বলেছেনঃ « كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ » 'প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।'[তিরমিযী - ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ - ৩৫৩৫৭]। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রণয়নে। তারপরেও চোখের অগোচরে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আপনাদের চোখে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করা হবে। অতএব, এই হাদীসের আলোকে পাঠকবৃন্দকে বলব যে, ছোটখাট ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করি।

সবশেষে সঠিক ইসলাম রক্ষার জন্য ও মুসলিম সমাজের কল্যানের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ আপনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দ্বীনি খেদমতে আরও বেশি বেশি খেদমত করতে পারি তাঁর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে,

লেখকঃ সাজ্জাদ সালাদীন

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিকা

إِنَّ الْحَمْدُ لِلّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, যে দ্বীনে মানুষের পক্ষ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হয় না। সালাত ও সালাম তাঁরই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহর দ্বীনের রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছেন, কোথাও কোন কার্পণ্য করেননি। দ্বীন হিসাবে যা কিছু এসেছে তিনি তা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন ও নিজের জীবনে বাস- বায়ন করে গেছেন। তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর আদর্শ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ পালনে সকলের চেয়ে অগ্রগামী।

আধুনিককালে অধিকাংশ লোকের ধারণা যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (صلى الله عليه وسلم) এর যুগে ছিলনা তা-ই বিদ'আত। আবার অনেকে মনে করেন বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি একটি বিদ'আত, মসজিদে কাতার করে নামায পড়া বিদ'আত, বিমানে হজ্জে যাওয়া বিদ'আত, মাইকে আজান দেয়া বিদ'আত ইত্যাদি। এ সকল দিক বিবেচনা করে তারা বিদ'আতকে নিজেদের খেয়াল খুশি মত দুই ভাগ করে কোনটাকে হাসানাহ (ভাল বিদ'আত) আবার কোনটাকে সাইয়্যেআহ (মন্দ বিদ'আত) বলে চালিয়ে দেন। আসলে বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ বিভ্রান্তি। তাই অধিকাংশ এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেন। বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। সত্যি কথা হল বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করাটা হল আরেকটি বিদ'আত এবং তা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن العرباض بن سارية)

অর্থঃ সকল নব-আবিস্কৃত (দীনের মধ্যে) বিষয় হতে সাবধান! কেননা প্রত্যেকটি নব-আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেকটি বিদ'আত হল পথভ্রষ্টতা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)[1] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা। এখন যদি বলা হয় কোন কোন বিদ'আত আছে যা হাসানাহ বা উত্তম, তাহলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হাদীসবিরোধী হয়ে যায়। তাই তো ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেনঃ

من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ'আতের প্রচলন করে আর ইহাকে হাসানাহ বা ভাল বলে মনে করে, সে যেন

[1] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে খিয়ানাত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا سورة المائدة

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)[2] রাসূল (সাঃ) ও এ বিদ’আত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وعن جابر، رضي الله عنه ، كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبحكم ومساكم" ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين أصبعيه؛ السبابة والوسطى، ويقول: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ثم يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلى" ((رواه مسلم)).

وعن العرباض بن سارية، رضي الله عنه ، حديثة السابق في باب المحافظة على السنة

[2] সূরা মায়েদা, আয়াত নং -৩

হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল বর্ণ ধারণ করত, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলন্দ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত; (তখন মনে হতো) তিনি যেন কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেনঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (দিবা-রাত্র) ভালো রাখুক।' তিনি আরো বলতেনঃ 'আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাঠানো হয়েছে।' একথা বলেই তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করতেন এবং বলতেনঃ অতপর সবচেয়ে ভালো বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদআত --- নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদআত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেনঃ 'আমি প্রতিটি মুমিনের জন্য তার নিজের চাইতেও উত্তম।' যে ব্যক্তি পিছনে কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ কিংবা রেখে যায় অসহায় সন্তান, তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তায়।(সহীহুল মুসলিম) (তথ্যসূত্রঃ তাহক্বীক – রিয়াদুস সালেহীন, তাওহীদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ১০৫)[3]

[3] তাহক্বীক – রিয়াদুস সালেহীন, তাওহীদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং – ১০৫

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যা ধর্ম রূপে গণ্য ছিল না আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। তাই বিদ‘আতে হাসানাহ বলে কোন কিছু নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন আমরা তাই বলব; সকল প্রকার বিদ‘আত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। বিদ‘আতে হাসানায় বিশ্বাসীরা যা কিছু বিদ‘আতে হাসানাহ হিসাবে দেখাতে চান সেগুলো হয়ত শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত, শরয়ী অর্থে নয় অথবা সেগুলো সুন্নাতে হাসানাহ। যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما)

অর্থঃ যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল সে উহার সওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে উহার পাপ বহন করবে এবং যারা সেই

পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না। (সহীহুল মুসলিম)[4]

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, শবে বরাত উদযাপন, মীলাদ মাহফিল, মীলাদুন্নবী প্রভৃতি আচার- অনুষ্ঠানকে কি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করা যায় না? মাইকে আজান দেয়া, মাদ্রাসার পদ্ধতি প্রচলন, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো যদি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে শবে বরাত, মীলাদ, তাবলীগ জামাত ইত্যাদিকে কেন সুন্নতে হাসানাহ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না? পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিদ'আত হবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। যদি নতুন কাজটি ধর্মের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব লাভের আশায় করা হয়, তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে। আর যদি কাজটি ধর্মীয় হিসাবে নয় বরং একটা পদ্ধতি হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যেমন ধরুন মাইকে আজান দেয়া। কেউ মনে করেনা যে, মাইকে আজান দিলে সওয়াব বেশী হয় অথবা মাইক ছাড়া আজান দিলে সওয়াব হবে না। তাই সালাত ও আজানের ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহারকে বিদ'আত বলা যায় না। কিন্তু এখানে

---

[4] সহীহুল মুসলিম

http://islaminonesite.wordpress.com

উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা উম্মত উপকৃত হবে কিন্তু নিজে মাইক ব্যাবহারের কারণে সরাসরী কোনো উপকার পাচ্ছে না। এদিক থেকে চিন্তা করে দেখলে ঐ কাজটা করলে সওয়াবও হতে পারে, কেননা তিনি কাউকে ডাকছেন যে অন্যকাজে ব্যাস্ত আছে এবং এই মাইক ব্যাবহারের ফলে ঐ কর্মরত ব্যাক্তি সালাহ আদায় করতে পারছে। মূলত ডাকা উদ্দশ্য। তাই এটা বিদআত নয় বরং সুন্নাতে হাসানা। তাই বলতে হয় বিদ‘আত ও সুন্নাতে হাসানার মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, কোন কোন নতুন কাজ ধর্মীয় ও সওয়াব লাভের নিয়াত হিসাবে করা হয় আবার কোন কোন নতুন কাজ দ্বীনি কাজ ও সওয়াবের নিয়াতে করা হয় না বরং সংশ্লিষ্ট কাজটি সহজে সম্পাদন করার জন্য একটা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন আমরা যদি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসটির প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, একবার মুদার গোত্রের কতিপয় অনাহারী ও অভাবগ্রস্থ লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি সালাত আদায়ের পর তাদের জন্য উপসি'ত লোকজনের কাছে সাহায্য চাইলেন। সকলে এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ ও খাদ্য সামগ্রী দান করার পদ্ধতি দেখে উল্লিখিত কথাগুলি বললেন।

অভাবগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য যে পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ওটাকে সুন্নাতে হাসানাহ বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে, সকল পদ্ধতি যদি হাসানাহ হয় তাহলে সুন্নাতে সাইয়্যেআহ বলতে কি বুঝাবে? উত্তরে বলব, মনে করুন কোন দেশের শাসক বা জনগণ প্রচলন করে দিল যে এখন থেকে স্থানীয় ভাষায় আজান দেয়া হবে, আরবী ভাষায় দেয়া চলবে না। এ অনুযায়ী 'আমল করা শুরু হল। এটাকে আপনি কি বলবেন? বিদ'আত বলতে পারবেন না, কারণ যারা এ কাজটা করল তারা সকলে জানে অনারবী ভাষায় আজান দেয়া ধর্মের নির্দেশ নয় এবং এতে সওয়াবও নেই। তাই আপনি এ কাজটাকে সুন্নাতে সাইয়্যেআহ হিসাবে অভিহিত করবেন। এর প্রচলনকারী পাপের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, আর যারা 'আমল করবে তারাও। আবার অনেক উলামায়ে কিরাম বিদ'আতকে অন্যভাবে দু ভাগে ভাগ করে থাকেন। তারা বলেন বিদ'আত দু প্রকার। একটা হল বিদ'আত ফিদ্দীন (البدعة في الدين) বা ধর্মের ভিতর বিদ'আত। অন্যটা হল বিদ'আত লিদ্দীন (البدعة للدين) অর্থাৎ ধর্মের জন্য বিদ'আত। প্রথমটি প্রত্যাখ্যাত আর অন্যটি গ্রহণযোগ্য। আমার মতে এ ধরণের ভাগ নিষ্প্রয়োজন বরং তা বিভ্রান্তি-সৃষ্টিতে সহায়ক। কারণঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল বিদ‘আত পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। এতে উভয় প্রকার বিদ‘আত শামিল।

দ্বিতীয়তঃ অনেকে বিদ‘আত ফিদ্দীন করে বলবেন, আমি যা করেছি তা হল বিদ‘আত লিদ্দীন। যেমন কেহ মীলাদ পড়লেন। অতঃপর যারা এর প্রতিবাদ করলেন তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে অনেক দূর যেয়ে বললেন, মীলাদ পড়া হল বিদ‘আত লিদ্দীন। এর দ্বারা মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা যায়। আসলে যা বিদ‘আত লিদ্দীন বা দ্বীনের স্বার্থে বিদ‘আত তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ‘আতের মধ্যে গণ্য করা যায় না। সেগুলোকে সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করাটাই হাদীসে রাসূল দ্বারা সমর্থিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বিদ‘আত সম্পর্কে এ কথাগুলো এখানে এ জন্য আলোচনা করলাম যাতে আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি-র সৃষ্টি হলে তার সমাধান যেন পাঠকবৃন্দ সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বিদ‘আতের কুফল এমন অনেকের সাক্ষাত পাবেন যারা ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই কেউ কেউ বলেন যে, বিদ‘আতের বিরোধিতায় এত বাড়াবাড়ির কি দরকার? কেহ একটু মীলাদ

পড়লে, কুলখানি বা চল্লিশা-চেহলাম পালন কিংবা এ জাতীয় কিছু করলে দ্বীন ইসলামের কি এমন ক্ষতি হয়ে যায়? উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, আমি একদিন এক মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে এ রাতে কোন বিশেষ সালাত, ইবাদাত-বন্দেগী বা সিয়াম নেই। যদি শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে কোন ‘আমল করা হয় তা বিদ‘আত হিসাবেই গণ্য হবে। তার এ বক্তব্য শেষ হতে না হতেই কয়েকজন শিক্ষিত শ্রেণীর মুসল্লী বলে উঠলেন, হুজুর এ কি বলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতে এ রাতে কিছু করলে বিদ‘আত হবে কেন? প্রশ্নকারী লোকগুলো যে বিভ্রান্ত বা বিদ‘আতপন্থী তা' নয়। তাদের খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই। তারা যা করার ইচ্ছা করেছেন, সেটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতেও থাকবে। সেই আবেগ যেন মুহব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ'আতের সংজ্ঞাঃ

শাব্দিক অর্থে বিদ'আত (بِدعَت):

বিদআতের শাব্দিক অর্থ হলো অভূতপূর্ব ও নতুন কোন বিষয়। এ শব্দটি শাব্দিক অর্থে সাধারণত কর্তার পূর্ণতা ও সৃষ্টিশীল বৈশিষ্টের ইঙ্গিতবহ। (بَدِيع) শব্দের অর্থ হলো অভিনব ও নজীরবিহীন,এ শব্দটি যখন মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হলো মহান আল্লাহ বিশ্বকে কোন পূর্ববর্তী নজীর ছাড়াই কারো সাহায্য ব্যতীত ও কোন প্রাথমিক উপাদান ভিন্নই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন নমুনারই অনুসরণ করেন নি।(অভিধান গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য। আল আইন, মুফরাদাত লি রাগিব ইসফাহানী, লি সানুল আরাব প্রভৃতি,' بِ د ع' ধাতু) ।বিদ'আত শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষন নিম্নে আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থপন করে আলোচনা করা হলোঃ-

(১) বাদিউন শব্দের অর্থ সৃষ্টি করাঃ এমন কিছু সৃষ্টি করা যার কোন অস্তিত্ব বা নজির আগে ছিল না। আমাদের এই বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলার এক সিফাতি নাম হলোঃ বাদিউল আলম।

http://islaminonesite.wordpress.com

(২) বাদউন শব্দের অর্থ আবিষ্খার করাঃ কোন বস্তু আমাদের অজ্ঞাত ছিল তা আবিষ্কার করা হয়েছে। আমেরিকা মহাদেশ কলম্বাস তা আবিষ্কার করেছেন, ভূ-গর্ভতে খনিজ পদার্থ বের করাকে বাদউন বলা হয়।

(৩) বিদ'উন শব্দের অর্থ উদ্ভাবন করাঃ মহান আল্লার সৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, মহান আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমনঃ লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পেট্রোল, ডিজেল, কাঠ, বাঁশ, মাটি, পানি, পাথর ইত্যাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কারিগর, প্রস্তুতকারীগণ বিভিন্ন প্রকার বস্ত তৈরী করেছেন|

যেমনঃ বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলফোন, এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরী করাকে বলা হয় বিদউন।

ধর্ম নির্বীশেষে সব মানুষগণ এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। এতে দ্বীন ইসলামে পাপ বা সাওয়াবের কিছু নেই।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানুতালা পবিত্র কুরআনে সয়ং সূরা আস-সাফফাতের ৯৬নং আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

http://islaminonesite.wordpress.com

'অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন'? (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং – ৯৬)।[5]

(৪) বিদ'আতুন শব্দের অর্থঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে ইসলামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যত কিছু আমাদের দিয়েছেন তাতেই ইসলাম সয়ংসম্পূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন ইসলামের নামে সাওয়াবের আশায়ে যে কোন নতুন প্রথা, রসম-রেওয়াজ প্রচলন করার নামই হলো বিদ্ 'আতুন' বা বিদ'আত। (তথ্যসূত্রঃ ইনিজিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ – ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম, পৃষ্ঠা নং – ৮৩)[6]

বিদ'আত শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষনঃ বিদ'আত বিষয়টি যেহেতু উপরে আলোচনা করা হয়েছে তারপরেও আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি নিম্নরূপ দাঁড়ায় যা উপস্থাপন করা হলোঃ-

শাব্দিক অর্থে বিদআত (البدع) থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হচ্ছে,

[5] সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং – ৯৬

[6] ইনিজিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ – ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম, পৃষ্ঠা নং – ৮৩

http://islaminonesite.wordpress.com

الاختراع على غير مثال سابق.

অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন আবিষ্কার।

এ থেকেই আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. البقرة:(١١٧)

অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত আকাশ জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف:٩)

অর্থাৎ 'আমিই প্রথম ব্যক্তি নই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট রিসালতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।' বরং আমার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন।

প্রচলন আছে: ابتدع فلان بدعة অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শুরু করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। শরয়ি পরিভাষায় বিআত বলা হয়ঃ-

ما أحدث فى الدين على خلاف ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل.

'দ্বীনের মধ্যে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো।'

অধিকন্তু বলা যায় যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা'র ঘোষনায় দ্বীন ইসলাম ১৪০০ বৎসর আগেই সম্পূর্ণ। কারন আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যেঃ আমি এই কিতাবে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেই নি। (সূরা আনআম, আয়াত নং – ৩৮)।[7]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেছেন যে, "আখেরি রাসূল তোমাদের জন্যে যা এনেছেন বিনাশর্তে গ্রহণ কর, আর তা থেকে বিরত থেকে থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন।" (সূরা হাশরঃ আয়াত নং - ৭)[8]।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতটি সহীহ হাদীসেও এসেছে। নিম্নে হাদীসটি উপস্থাপন করা হলোঃ-

[7] সূরা আনআম, আয়াত নং - ৩৮

[8] সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»

:: সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদিস ১ (রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরন অধ্যায়)[9]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রাক'আত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো। তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ২। তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; সহীহাহ ৮৫০।

বিদআত শব্দটি হাদীস গ্রন্থসমূহে সাধারণত শরীয়ত ও সুন্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন কিছু

---

[9] সুনানু ইবনে মাজাহ্ - হাদিস ১ [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরন অধ্যায়]

http://islaminonesite.wordpress.com

করা যা ইসলামী শরীয়ত ও মহানবী (صلى الله عليه وسلم) - এর সুন্নাতের পরিপন্থী বলে গণ্য। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

إنّما النّاس رجلان متبع شرعة و مبتدع بدعة

অর্থাৎ 'মানুষ দু' ধরনের হয় যেমনঃ শরীয়তের অনুসারী, নতুবা ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভাবক' । (নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬)।[10] অন্যত্র তিনি মহানবীর নবুওয়াত সম্পর্কে বলেছেন:-

إظهر به الشرائع المجعولة و قمع به البدع المدخولة

'মহান আল্লাহ মহানবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের অজানা ও ভুলে যাওয়া শরীয়তের সাথে পরিচিত করিয়েছেন (অজানা বিধানসমূহকে তাদের সামনে প্রকাশ করেছেন) এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের মধ্যে যে বিদআত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ সংযোজিত হয়েছিল তা হতে পরিশুদ্ধ করেছেন।'(প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৬১)[11]

অন্যত্র হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنّة

---

[10] নাহজুল বালাগা,খুতবা নং ১৭৬

[11] প্রাগুক্ত,খুতবা নং ১৬১

http://islaminonesite.wordpress.com

এমন কোন বিদআতই (নব উদ্ভাবিত বিষয়ই) শরীয়তে প্রবেশ করে নি যার দ্বারা কোন না কোন সুন্নাত উপেক্ষিত ও পদদলিত না হয়েছে।’ (তথ্যসূত্রঃ প্রাগুক্ত, খুতবা নং - ১৪৫)[12]

উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সাওম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদের ব্রত গ্রহন করা।

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর হাদীসে যারা সারা বছর সাওম রাখার ও বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেছিলেনঃ

“আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভয় পোষণ করি এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। কিন্তু আমি সওম পালন করি ও ভাঙ্গি, সালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাপন

[12] প্রাগুক্ত,খুতবা নং ১৪৫

http://islaminonesite.wordpress.com

করি এবং নারীদের বিবাহ করি। যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিরাগভাজন হয়, যে আমার দলভুক্ত নয়।”

বিদ‘আতের আভিধানিক অর্থঃ

الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى (قل ما كنت بدعا من الرسل) وجاء على هذا المعنى قول عمر رضيالله عنه) نعمت البدعة)

অর্থঃ পূর্বের দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন সৃষ্ট কোন বিষয় বা বস্তু। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “বলুন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই”। আসলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল হিসাবে নতুনই। কিন্তু এ আয়াতে বিদ‘আত শব্দের অর্থ হল এমন নতুন যার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে গত হয়নি। আর উমার (রাঃ) তারাবীহর জামাত কায়েম করে বলেছিলেন “এটা উত্তম বিদ’আত।” এখানেও বিদ‘আতের আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সাধারন ভাবে সুন্নতের বিপীরত বিষয়কে বিদাত বলে। আর শার’ঈ ভাবে বিদআত হলো “আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন কোন প্রথা বা ইবাদতের

প্রচলন করা যা শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয় (তথ্যসূত্রঃ আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা)।[13]

اَلشَّيْءُ الْمُخْتَرَعُ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন নমুনা ছাড়াই নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। (তথ্যসূত্রঃ আন-নিহায়াহু, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং – ১৭)।[14]

আর শরীয়তের পরিভাষায় বলা যায় যে -

مَا أُحْدِثَ فِى دِيْنِ اللهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَامٌ وَلاَخَاصٌّ يَدُلُّ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরীয়তের কোন ব্যাপক ও সাধারণ কিংবা খাস ও সুনির্দিষ্ট দলীল নেই। (তথ্যসূত্রঃ কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং – ২৪)।[15]

এ সংজ্ঞাটিতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

---

13 আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা

14 আন-নিহায়াহু, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং – ১৭

15 কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং – ২৪

১. নতুনভাবে প্রচলন অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না এবং এর কোন নমুনাও ছিল না।

২. এ নব প্রচলিত বিষয়টিকে দ্বীনের মধ্যে সংযোজন করা এবং ধারণা করা যে, এটি দ্বীনের অংশ।

৩. নব প্রচলিত এ বিষয়টি শরীয়তের কোন ‘আম বা খাস দলীল ছাড়াই চালু ও উদ্ভাবন করা।

সংজ্ঞার এ তিনটি বিষয়ের একত্রিত রূপ হল বিদআত, যা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ শরীয়তে এসেছে। কঠোর নিষেধাজ্ঞার এ বিষয়টি হাদীসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদ’আতের সংজ্ঞা

ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه

‘যা কিছু আল্লাহর দ্বীনে নতুন সৃষ্টি করা হয় অথচ এর সমর্থনে কোন ব্যাপক বা বিশেষ দলীল প্রমাণ নেই।’

অর্থাৎ নব সৃষ্ট বিষয়টি অবশ্যই ধর্মীয় ব্যাপারে হতে হবে। যদি ধর্মীয় ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে নব-আবিস্কৃত কিছু দেখা যায় তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য হবে না, যদিও শাব্দিক অর্থে তা বিদ'আত।

এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) তার 'শির্ক ও বিদ'আত' কিতাবে বিদ'আতের পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তা হলঃ যে বিশ্বাস বা কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি কিংবা পালন করার নির্দেশ দেননি সেই ধরনের বিশ্বাস বা কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা, এর অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা, সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে এই ধরনের কাজ করার নাম বিদ'আত। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এবং মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে বিদআতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ নিম্নে বিদ'আত সম্বন্ধে প্রখ্যাত আলেমদের দেয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করছিঃ

১। ইবনে রাজাব হাম্বালী (রহঃ) বলেছেনঃ 'বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত বিষয় যার শরীয়তগত কোন ভিত্তি ও দলিল-

প্রমাণ নেই। যদি কোন কিছুর শারয়ী দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য নয়, যদিও শাব্দিক অর্থে তা বিদআত হয়ে থাকে।’ (জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম,পৃ. ১৬০)।[16]

২। ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেনঃ ‘বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত এমন বিষয় যার কোন শরীয়তগত প্রমাণ ও দলিল নেই। যদি শরীয়তে তার সপক্ষে কোন দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না।’ (ফাতহুল বারী, ১৭তম খণ্ড, পৃঃ ৯)।[17]

৩। সাইয়্যেদ মুর্তাজা (রহঃ) বলেছেনঃ ‘বিদআত হলো ধর্মে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে তাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করা।’ (রিসালাতু শারিফ আল মুরতাজা, ২য় খণ্ড,পৃ. ২৬৪)।[18]

৪। আল্লামা মাজলিসী (রহঃ) বলেছেনঃ ‘শরীয়তের ক্ষেত্রে বিদআত হলো এমন বিষয় যা রাসূলের মৃত্যুর পর ধর্মে সংযোজন করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে কোন প্রমাণ কোরআন ও সুন্নাহয় নেই। তবে তা সাধারণ কোন বিষয়ের

---

[16] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম,পৃ. ১৬০

[17] ফাতহুল বারী, ১৭তম খণ্ড,পৃ. ৯

[18] রিসালাতু শারিফ আল মুরতাজা,২য় খণ্ড,পৃ. ২৬৪

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্তর্ভুক্ত হলে বিদআত হবে না।’ (বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড,পৃ. ২০২)।[19]

হাদীসশাস্ত্র, প্রখ্যাত আলেম ও ফিকাহবিদদের বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিদআত পারিভাষিক অর্থে ধর্মে কোরআন ও সুন্নাহর দলিল ব্যতিরেকে কোন নতুন বিধান সংযোজন বা বিয়োজন।

বিদ’আতের বৈশিষ্ট্যঃ বিদ’আতের ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে -

১। বিদআতকে বিদআত হিসেবে চেনার জন্য সুনির্দীষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতিগত ’আম ও সাধারনণ দলীল পাওয়া যায়।

২। বিদআত সবসময়ই শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মাকাসিদ এর বিপরীত ও বিরোধী অবস্থানে থাকে আর এ বিষয়টিই বিদআত নিকৃষ্ট ও বাতিল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমান। এ জন্যই হাদীসে বিদ’আতকে ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[19] বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড,পৃ. ২০২

http://islaminonesite.wordpress.com

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআত এমন সব কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন,

البِدْعَةُ عِبارةٌ عَنْ فِعلٍ لَمْ يَكُنْ فابتُدِعَ

বিদআত বলতে বুঝায় এমন কাজকে যা ছিল না, অতঃপর তা উদ্ভাবন করা হয়েছে’।(তথ্যসূত্রঃ তালবীসু ইবলীস, পৃষ্ঠা নং – ১৬)।[20]

৪। বিদআতের সাথে শরীয়তের কোন কোন ইবাদতের কিছু মিল থাকে। দু’টো ব্যাপারে এ মিলগুলো লক্ষ্য করা যায়ঃ- প্রথমতঃ দলীলের দিক থেকে এভাবে মিল রয়েছে যে, কোন একটি আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনার ভিত্তিতে বিদ’আতটি প্রচলিত হয় এবং খাস ও দলীলকে পাশ কাটিয়ে এ আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনাটিকে বিদআতের সহীহ ও সঠিক দলীল বলে মনে করা হয়।

[20] তালবীসু ইবলীস, পৃষ্ঠা নং – ১৬

দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত প্রণীত ইবাদতের রূপরেখা ও পদ্ধতির সাথে বিদ'আতের মিল তৈরী করা হয় সংখ্যা, আকার-আকৃতি, সময় বা স্থানের দিক থেকে কিংবা হুকুমের দিক থেকে। এ মিলগুলোর কারনে অনেকে একে বিদআত মনে না করে ইবাদত বলে গণ্য করে থাকেন।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বিদ'আত সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, যে সকল বিশ্বাস ও কাজকে দ্বীনের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব হবে ধারণা করে 'আমল করা হয় তা বিদ'আত। কারণ হাদীসে এসেছে: আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"আমাদের এ দ্বীনে যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাক্ত।" [তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারী: ২৫১২, মুসলিম: ৩২৪৮][21]। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, নতুন আবিস্কৃত বিষয়টি যদি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত।

---

[21] সহীহুল বুখারী: ২৫১২, মুসলিম: ৩২৪৮

হাদীসে আরো এসেছেঃ “যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত”। (সহীহুল মুসলিম)[22]। এ হাদীসে “যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই” বাক্যটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, বিষয়টি ধর্মীয় হতে হবে। ধর্মীয় বিষয় হিসাবে কোন নতুন ‘আমল করলেই বিদ’আত হবে।

দ্বীনের ভিতর বিদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বীনের ভিতর সকল বিদ’আতই হারাম। যারা বিদ’আতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন এবং রাসূল (সাঃ) - এর বানী فإن كل بدعة ضلالة নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদ’আত গোমরাহ্ এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদ’আত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বিদ’আতই গোমরাহি আর মাযহাবপন্থীরা বলছে, না প্রত্যেক বিদ’আত গোমরাহি নয় বরং কিছু বিদ’আত আছে হাসানাহ (ভাল)। আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেন: নবী আকরাম (সাঃ) - এর বাণী كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বিদ’আত গোমরাহি) একটি جوامع الكلم তথা ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত

[22] সহীহুল মুসলিম

http://islaminonesite.wordpress.com

নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে)।

সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় যথা আকায়েদ, আমল জাহেরী ও বাতেনী আকওয়াল সব সমান।

এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডনঃ

সাহাবী ওমর (রাঃ) একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন: نعمت البدعة هذه (কত না সুন্দর বিদ'আত এটি) বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই। তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের

কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদীস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল (সাঃ) নিজে করে যাননি।

আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বিদ'আত নয় বরং শরীয়তের এগুলোর একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য نعمت البدعة তে শরঈ بدعة নয়।

সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরঈ ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন بدعة বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বিদ'আত বুঝতে হবে শরঈ নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই সাহাবীদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন।

এক পর্যায়ে এসে ওমর (রাঃ) সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করা হলোঃ-

তারবীহ সালাতের ১১ রাকাতের দলীলঃ আধুনিক কালের ইজমার উদাহরন হিসাবে ২০ রাকাত তারাবীহ সালাতের কথা বলা যায়।নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ হানাফী আলেমগণই ২০ রাকআত তারাবী পড়ার পক্ষের হাদীসগুলোকে যঈফ বলেছেন।

হানাফী মাযহাবের যে সমস্ত বিজ্ঞ আলেম ২০ রাকআত তারাবী পড়ার পক্ষের হাদীসগুলাকে যঈফ বলেছেন, তাদের নামের একটি বিশাল তালিকাঃ-

১) মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায়ঃ কিয়ামে শাহরে রামাযান, পৃষ্ঠা নং-১৩৮। মুস্তফায়ী ছাপা, ১২৯৭ হিঃ।[23]

২) নাসবুর রায়া, (২/১৫৩) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী,মাজলিসুল ইলমী ছাপা, ভারত।[24]

৩) মিরকাতুল মাফাতীহ, (৩/১৯৪) মোল্লা আলী কারী হানাফী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, মুলতান, ভারত।[25]

[23] মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায়ঃ কিয়ামে শাহরে রামাযান, পৃষ্ঠা নং-১৩৮। মুস্তফায়ী ছাপা, ১২৯৭ হিঃ।

[24] নাসবুর রায়া, (২/১৫৩) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী,মাজলিসুল ইলমী ছাপা, ভারত।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪) উমদাতুল কারী শরহে সহীহ আল-বুখারী, (৭/১৭৭) প্রণেতা আল্লামা বদরুদ দীন আইনী হানাফী মিশরী ছাপা।[26]

৫) ফতহুল কাদীর শরহে বেদায়া (১/৩৩৪) প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী। [27]

৬) হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী (১/১৫৪) প্রণেতা মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপুরী।[28]

৭) আল-বাহরুর রায়েক (২/৭২) প্রণেতা ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফী।[29]

৮) হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার (১/২৯৫) প্রণেতা আল্লামা তাহাভী (رحيمه الله) হানাফী।[30]

---

[25] মিরকাতুল মাফাতীহ,(৩/১৯৪) মোল্লা আলী কারী হানাফী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, মুলতান, ভারত।

[26] উমদাতুল কারী শরহে সহীহ আল-বুখারী,(৭/১৭৭)প্রণেতা আল্লামা বদরুদ দীন আইনী হানাফী মিশরী ছাপা।

[27] ফতহুল কাদীর শরহে বেদায়া (১/৩৩৪) প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী।

[28] হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী (১/১৫৪) প্রণেতা মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপুরী।

[29] আল-বাহরুর রায়েক (২/৭২) প্রণেতা ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফী।

[30] হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার (১/২৯৫) প্রণেতা আল্লামা তাহাভী (রহঃ) হানাফী।

http://islaminonesite.wordpress.com

৯) দুররুল মুখতার (ফতোয়া শামী) (১/৪৯৫) প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী।[31]

১০) হাশিয়াতুল আশবাহ পৃষ্ঠা নং - ৯ প্রণেতা সায়্যেদ আহমাদ হামুভী হানাফী।[32]

১১) হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক পৃষ্ঠা নং - ২৬, প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ নানুতুভী।[33]

১২) মারাকীউল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ পৃষ্ঠা নং- ২৪৭, প্রণেতা আবুল হাসান শরানবালালী।[34]

১৩) মা ছাবাতা ফিস সুন্নাহ,পৃষ্ঠ নং- ২৯২, প্রণেতা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী।[35]

---

[31] দুররুল মুখতার (ফতোয়া শামী) (১/৪৯৫) প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী।

[32] হাশিয়াতুল আশবাহ পৃষ্ঠা নং - ৯ প্রণেতা সায়্যেদ আহমাদ হামুভী হানাফী।

[33] হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক পৃষ্ঠা নং - ২৬, প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ নানুতুভী।

[34] মারাকীউল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ পৃষ্ঠা নং- ২৪৭, প্রণেতা আবুল হাসান শরানবালালী।

[35] মা ছাবাতা ফিস সুন্নাহ,পৃষ্ঠ নং- ২৯২,প্রণেতা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৪) মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুভী হানাফী বিভিন্ন কিতাবের হাশিয়াতে ২০ রাকআতের হাদীছগুলোকে যঈফ বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন উমদাতুর রেআয়া (১/২০৭)।[36]

১৫) তালীকুল মুমাজ্জাদ, পৃষ্ঠা নং - ১৩৮।[37]

১৬) তুহফাতুল আখয়ার পৃষ্ঠা নং-২৮, লাখনু ছাপা।[38]

১৭) হাশিয়ায়ে হেদায়া (১/১৫১) কুরআন মহল, করাচী ছাপা।[39]

১৮) ফাইযুল বারী, (১/৪২০) প্রণেতা মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী।[40]

১৯) আলউরফুয্ শাযী পৃষ্ঠা নং- ৩০৯।[41]

---

[36] মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুভী হানাফী বিভিন্ন কিতাবের হাশিয়াতে ২০ রাকআতের হাদীছগুলোকে যঈফ বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন উমদাতুর রেআয়া (১/২০৭)।

[37] তালীকুল মুমাজ্জাদ, পৃষ্ঠা নং-১৩৮।

[38] তুহফাতুল আখয়ার পৃষ্ঠা নং-২৮,লাখনু ছাপা।

[39] হাশিয়ায়ে হেদায়া (১/১৫১) কুরআন মহল, করাচী ছাপা।

[40] ফাইযুল বারী,(১/৪২০) প্রণেতা মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী।

http://islaminonesite.wordpress.com

২০) কাশফুস সিতর আন সালাতিল বিতর পৃষ্ঠা নং- ২৭[42]।

২১) শরহে মুআত্তা ফারসী, (১/১৭৭) প্রণেতা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। কুতুব খান রাহীমিয়া, দিল্লী, ১৩৪৬ হিঃ।[43]

উপরোক্ত আলেমগণ ছাড়া আরও অনেকেই ২০ রাকআত তারাবীর হাদীসগুলোকে যঈফ বলেছেন। উক্ত তথ্যগুলো জানার পর কেউ ২০ রাকআত তারবীর পক্ষের হাদীসগুলো সহীহ বলা থেকে সকলেই বিরত থাকবেন এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আমাদের সকলকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার এবং জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন। এছাড়াও হযরত উমর (رضي الله عنه) এর সময় ইজমার মাধ্যমে যে ২০ রাকাত তারাবীর কথা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্নই জাল হাদীস দ্বারা প্রমানিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলোঃ-

---

41 আলউরফুয্ শাযী পৃষ্ঠা নং- ৩০৯।

42 কাশফুস সিতর আন সালাতিল বিতর পৃষ্ঠা নং- ২৭।

43 শরহে মুআত্তা ফারসী,(১/১৭৭) প্রণেতা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। কুতুব খান রাহীমিয়া, দিল্লী, ১৩৪৬ হিঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব ইজমায়ে সাহাবা কর্তৃক ওমর, ওসমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক‘আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে সৃষ্ট। হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাক‘আত তারাবীহ পড়তেন যা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) হ’তে প্রমাণিত। (তথ্যসূত্রঃ হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২)।[44] রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) রামাযান মাসে বিতর সহ ১১ রাক‘আতের বেশী রাতের সালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃষ্ঠা; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ)।[45] ওমর (رضي الله عنه) উবাই বিন কা’ব ও তামীম দারী (رضي الله عنه) - কে রামাযান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাকা‘আত (তারাবীহ) সালাত আদায়ের নির্দেশ

[44] হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১; দ্র: তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২

[45] বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পঃ:; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্রঃ মুওয়াত্ত্বা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ ছহীহ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)।[46]

তারবীহ সালাতের ১১ রাকাতের নির্ভরযোগ্য দলীল উপস্থাপন

ইমাম মালেক ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরামগণ ইবন খাসীফাহকে হুজ্জত মনে করেন। যেহেতু ইয়াযীদ ইবন খাসীফাহ এর বর্ণনা সহীহ হওয়ার দিক থেকে দুর্ভোদ্য ও অপ্রতুল। কেননা এটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত। কেননা ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ উভয়ে নির্ভরযোগ্য এবং তারা সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন একুশ রাকা'আত, আর দ্বিতীয়বার এগার রাকা'আত। ফলে দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকার পাবে। এখানে দুটি দিক রয়েছে। যেমনঃ প্রথমদিকঃ তিনি তাঁর সাথীর চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এজন্য হাফেয ইবন হাজর ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ এর গুণ বর্ণনায় বলেছেন সিকাহ বা

---

[46] মুওয়াত্ত্বা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ ছহীহ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ

http://islaminonesite.wordpress.com

নির্ভরযোগ্য। আর মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের শানে বলেছেনঃ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়দিকঃ অনুরূপভাবে মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ সায়েব এর বোনের ছেলে। আর তিনি তার মামার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

উপরের বর্ণনাটি ইয়যিদ ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের মতবিরোধের মূল বর্ণনা। আর আলিমগণ ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহকে যঈফ বলেননি। বরং তারা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (رحيمه الله) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; ইয়াযিদ ইবন রুমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে মানুষ তেইশ রাকা'আত সালাত আদায় করত। আলোচ্য বর্ণনাটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদে; কেননা ইয়াযিদ ইবন রুমান ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি।ইবন আবু শাইবাহ ওকী' হতে, তিনি মালেক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'ওমর ইবনুল খাত্তাব এক ব্যক্তিকে বিশ রাকা'আত সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা, কেননা

ইয়াহইয়া ইবন সাইদ ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি। ইবন মাদিনী বলেন: আমার জানা নেই তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে শুনেছেন কি না।

দ্বিতীয় 'আছার': উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত: ইবন আবি শাইবাহ আব্দুল আযীয ইবন রুফাঈ' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে মদিনাতে উবাই ইবন কা'ব বিশ রাকা'আত সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকা'আত বিতির পড়তেন। এ বর্ণনাটিও মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। কেননা আব্দুল আযীয উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৯ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মারা গিয়েছেন, আর আব্দুল আযীয মারা গেছে ১৩০ হিজরীতে। তার জীবনীতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে তিনি উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র ছোট সাহাবী ও বড় বড় তাবেঈন থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় 'আছার': ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: মুহাম্মদ ইবন নসর আল- মারওয়াযী হতে কিয়ামুল লাইল

সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আ'মাশ বলেন, ইবন মাসউদ বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ পড়তেন এবং তিন রাকা'আত বিতির সালাত পড়তেন। আলোচ্য বর্ণনাটিও মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। কেননা, নিশ্চয় আ'মাশ (رحيمه الله) ইবন মাসউদ কে পাননি।

চতুর্থ 'আছার': আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: ইমাম বায়হাকী তার সুনানে কুবরা গ্রন্থে আবুল হাসনা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে পাঁচ বার বিশ্রামের সাথে বিশ রাকা'আত তারাবীর সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য বর্ণনাটি যঈফ বা দুর্বল। কেননা আবুল হাসনা একজন অপরিচিত ব্যক্তি। ইমাম বায়হাকী অন্য আরেকটি বর্ণনায় হাম্মাদ ইবন শুয়াইব হতে এবং তিনি আতা ইবন আস-সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুর রহমান আস সুলামী হতে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে কারীদেরকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন, তারপর তাদের মধ্যে হতে একজনকে বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ সালাত মানুষদের পড়াতে নির্দেশ

দিলেন। আর তিনি [আলী (رضي الله عنه) স্বয়ং] লোকদের সঙ্গে বিতির সালাত আদায় করতেন। এ বর্ণনাটি দুর্বল বা যঈফ। কেননা, এখানে হাম্মাদ ইবন শু'য়াঈব দুর্বল রাবী।

ইমাম বায়হাকী আরও বলেন, আমাদের নিকট শাতীর ইবন শাকল বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গী ছিলেন। নিশ্চয় তিনি রমযান মাসে বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ ও তিন রাকা'আত বিতিরের ইমামতি করতেন।

পঞ্চম 'আছার': সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: - বায়হাকী হতে বর্ণিত তিনি তার সনদে বলেন, আমার নিকট আবু যাকারিয়া ইবন আবু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন, তার নিকট আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বর্ণনা করেছেন, তাকে জা'ফর ইবন আউন, এবং তাকে আবুল খুসাইব এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি পাঁচ বিশ্রামে বিশ রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এ হচ্ছে রমযানে কিয়ামুল লাইল হিসেবে বিশ রাকা'আত

http://islaminonesite.wordpress.com

তারাবীহ্ সালাতকে সুস্পষ্ট প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বর্ণনা। কিন্তু বর্ণানাকারীগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ মুনকার, আবার কারো বর্ণনা যঈফ, কেউ কেউ মুনকাতি।

যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনার পর বলা যায় যে, আর এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করাও শরীয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন।

হাদীস লিপিবদ্ধ করারও একটি শরয়ি ভিত্তি আছে। রাসূল (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদীস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে গায়রে কোরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার

http://islaminonesite.wordpress.com

উদ্দেশ্য হাদীস সংকলনে হাত দেন এবং সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ তারা স্বীয় প্রতিপালকের কিতাব এবং নিজ নবীর সুন্নাহ বৃথা যাওয়া ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে ইলম ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিদআতের প্রচলন উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগে শুরু হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু এখতেলাফ মতানৈক্য দেখতে পাবে। সেসময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত, হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরা।' সাহাবায়ে কেরাম সে সকল আহলে বি'দআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যেঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

(১) ঐ বিদ'আতী কাজ বা আমল আল্লাহর দরবারে কখনোই গৃহীত হবে না।

(২) বিদ'আতী কাজ বা আমলের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহী বিস্তার লাভ করে এবং

(৩) এ গোমরাহীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিদ'আত কার্য সম্পাদনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বিদআত উৎপত্তির কতিপয় কারণঃ বিদ'আত ও গোমরাহিতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারন ধরা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . (سورة الأنعام:১৫৩)

'এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ কর না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ

http://islaminonesite.wordpress.com

الأَوْسَطِ فَقَالَ " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ " . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দুটি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দুটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন: এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

(অর্থাৎ- এই হচ্ছে আমার সরল-সঠিক পথ, সুতরাং তোমরা একে অনুসরণ করো এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, নতুবা তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।) (সূরা আনআম ৬:১৫৪)[47] তাখরীজ কুতুবুত সিত্তাহ: আহমাদ ১৪৮৫৩ তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানীঃ যিলূলুল জান্নাহ ১৬। গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে

[47] সূরা আনআম ৬ : ১৫৪

http://islaminonesite.wordpress.com

মাজাহ, অধ্যায়ঃ ১/ রাসুল (সাঃ)'র সুন্নাতের অনুসরণ, হাদিস নম্বরঃ ১১)।[48]

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেনঃ

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله ثم قال থخط خطوطا عن يمينه و عن شماله، ثم قال : و هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه থيزيد متفرقة.

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের (দেখানোর) জন্য একটি রেখা টানলেন বা দাগ দিলেন অত:পর বললেন এটি আল্লাহর পথ। এর পর এ রেখার ডানে বামে আরো অনেকগুলো দাগ দিলেন এর পর বললেন: এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ। ইয়াযীদ নামক হাদিসের জনৈক বর্ণনাকারী বললেন বিচ্ছিন্নকারী (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্নকারী বিভিন্ন পথ) এরপর প্রত্যেকটি পথের উপর একটি করে শয়তান বসে আছে, সে পথের দিকে আহ্বান করে।

অত:পর পড়েছেনঃ

48 সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ১/ রাসুল (সাঃ)'র সুন্নাতের অনুসরণ, হাদিস নম্বরঃ ১১

http://islaminonesite.wordpress.com

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ . (الأنعام:١৫৩)

'এটিই আমার সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।' (সূরা: আল আনআম - ১৫৩)[49]

অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, এড়িয়ে চলবে, বিভ্রান্তকারী রাস্তা এবং নব আবিষ্কৃত বিদ'আত সমূহ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবে। তাই কুরআন-হাদীসে বিদআতের ভয়াবহতা দেখে সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমল বিনাশী ভয়াবহ বিদ'আত মুসলিম সমাজে কীভাবে চালু হলো? এ প্রসঙ্গে ইবনে উসাইমীন (রহঃ) বলেন, আমাদের সমাজে বিদ'আত বিভিন্নভাবে হতে পারে। এর মধ্যে -

১. কারণগতভাবেঃ যখন মানুষ আল্লাহর এমন ইবাদত করে, যা এমন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেটা শরী'আতের অংশ নয়, তা বিদ'আত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে তার উদ্ভাবনকারীর দিকে। যেমন কিছু লোক রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রি

[49] সূরা: আল আনআম - ১৫৩

http://islaminonesite.wordpress.com

জাগরণ করে ইবাদত করে এ যুক্তিতে যে, এ রাত্রিতে রাসূল কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব তাহাজ্জুদের সালাত একটা ইবাদত। কিন্তু যখন এ কারণের সাথে তা মিলে গেল তখন সেটা বিদ'আত সাব্যস্ত হল। কেননা সে এ ইবাদতের ভিত্তি নির্মাণ করে এক কারণের উপর যা শরী'আত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কারণের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়ার জন্য এ বিবরণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আত প্রকাশ পাবে, যেগুলো সুন্নাত না হওয়ার সত্ত্বেও সমাজে সুন্নাত বলে গণ্য করা হয়।

২. ধরনগতভাবেঃ ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়া আবশ্যক। যদি মানুষ এমন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করে, যার ধরন শরী'আত সমর্থিত নয়, তা'হলে সেটা অগ্রহনযোগ্য। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সিদ্ধ হবে না। কেননা সে ধরনের ক্ষেত্রে শরী'আতর বিরোধীতা করছে।

৩. পরিমাণগতভাবেঃ মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে তারা ফরয হিসাবে এক ওয়াক্ত সালাত বৃদ্ধি করবে, তা'হলে আমরা বলব যে, এটা বিদ'আত, অগ্রহনযোগ্য। কারণ পরিমাণের ক্ষেত্রে এটা শরী'আতের বিপরীত। আরো উত্তমভাবে বলা

যায়, যদি কোন লোক যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত করে তাহলে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তা সিদ্ধ হবে না।

৪. পদ্ধতিগতভাবেঃ যদি কোন লোক ওযু করা শুরু করে এবং প্রথমে দুই পা ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসাহ করে, এরপর দু'হাত ধৌত করে, তারপর মুখমন্ডল ধৌত করে, তাহলে আমরা বলব, তার ওযু বাতিল। কেননা সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন শারঈ বিধানের বিপরীত করেছে।

৫. সময় ও কালগতভাবেঃ যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনে কুরবানী দেয় তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার কুরবানী গ্রহনীয় হবে না। আমি শুনেছি কিছু লোক জবেহর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে ছাগল জবেহ করে। এ পদ্ধতিতে এ কাজটি বিদ'আত। কারণ কুরবানী ও আক্কিকার পশু জবেহ ছাড়া এমন কিছু নেই যার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং ঈদুল আযহার জবেহর মত নেকী পাওয়ার বিশ্বাসে রমযান মাসে জবেহ করলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে করলে সেটা বৈধ হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

৬. স্থানগতভাবেঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই’তিকাফ করে তাহলে তার ই’তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদ সমূহ ছাড়া অন্য কোথাও ই‘তিকাফ বৈধ নয়। যদি কোন মহিলা বলে, আমি বাড়ীতে মুসল্লায় ই’তিকাফ করব, তাহলে স্থানের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার ই’তিকাফ শুদ্ধ হবে না। দু’টি শর্তে উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত সৎ কর্ম হতে পারে না। প্রথম শর্ত হল- ইখলাস বা নিষ্ঠা। দ্বিতীয় শর্ত হল- আনুগত্য বা অনুসরণ। তবে পূর্বে উল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত অনুসরণ যথার্থ হবে না। আমি এ সকল লোকদের বলব, যাদের বিদ’আতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্য কখনও সৎ হতে ও যারা কল্যাণ কামনা করে, যখন আপনারা কল্যান কামনা করেন তখন আল্লাহর কসম করে বলছি! সালাফে সালেহীনের পথের চেয়ে অন্য কোন উত্তম পথের কথা আমাদের জানা নেই। (ইবনে উসাইমীন, সাবেক সৌদী সুপ্রিম ফতওয়া বোর্ড প্রধান)।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইলম ও ইবাদত বিষয়ক সর্ব প্রকার বিদ‘আত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। (তথ্যসূত্রঃ মাজমূ‘ফাতওয়া ১০/৩৫৪ পৃষ্ঠা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

ওসমান (রাঃ) - এর শাহাদত বরণের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হল, ঠিক তখনই সর্ব প্রথম হারুরিয়্যাহ’ বিদ‘আত প্রকাশ লাভ করলো। অতঃপর ছাহাবয়ে কেরামের শেষ যামানায় কদর’অর্থাৎ তাক্বদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের বিদ‘আত প্রকাশ লাভ করে। তার পরই ইরজা’ অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ নয় এই বিশ্বাসের বিদ‘আত তাশায়্যু অর্থাৎ রাসূলুল্লা (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য অধিকারী এই বিশ্বাসের উপর গঠিত হয় বিদ‘আত এবং খাওয়ারেজ‘ অর্থাৎ কাবীরা গুনাগার কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বিশ্বাসের বিদ‘আত প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর তাবেঈন শেষ যামানায় ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) - এর মৃত্যুর পরে খোরসানে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ) - এর খেলাফতকালে জাহমিয়াহদের উৎপত্তি হয়। আর উল্লিখিত বিদ‘আতগুলি দ্বিতীয় শতাব্দি হিজরীতে সৃষ্টি হয়। সে সময় ছাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এ সকল বিদ‘আত সাধ্যমত দমন করেছিলেন। অতঃপর ইসলামের সোনালী যুগের পরে এসে মু‘তাযিলা’(যারা নিজেদের জ্ঞান বা বিবেকের মান দন্ডে শরী‘তকে মানে) বিদ‘আতের সৃষ্টি হয়। তার পর তাছাউফ’বা ছূফীবাদ তথা

http://islaminonesite.wordpress.com

কবর পূজারীদের জন্ম হয়। এভাবে যুগের আর্বতনে বিশ্বব্যাপী রকমারী বিদ‘আত এর প্রাদুর্ভাব ঘটে।

যাই হোক, সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ’আত মুসলিম সমাজে চালু হওয়ার যে কতিপয় কার্যকারণ পাওয়া যায় তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ-

(১) ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুসলিম সমাজে বিদআত চালু হওয়ার অন্যতম কারণ। ঈমান-আমল হেফাযত করতে আবশ্যক পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যই ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনের যথার্থ জ্ঞানের অনুপস্থিতি মুসলিম সমাজকে যেমন কলুষিত, পশ্চাৎপদ করেছে ঠিক তেমনি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই বিদআত প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। মূলতঃ রাসূলের যুগ থেকে সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং মানুষ রিসালাতের প্রভাব ও নিদর্শন থেকে দূরে সরে চলেছে ততই ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান কমে চলেছে এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছে ও সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। বরং এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) নিজেই বলেছেনঃ

من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।' তিনি আরও বলেনঃ

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، و لكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، و أضلوا.

'আল্লাহ তাআলা ইলম বান্দাদের থেকে উপড়ে নেয়ার মত করে উঠিয়ে নিবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে।' তাই বিদআতকে একমাত্র ইলম ও ওলামারাই প্রতিরোধ করতে পারেন এবং করেও থাকেন। যখন এতদুভয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন বেদআত প্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ পেয়ে যায়, আর বেদআতপন্থীরা এ বিষয়ে নব উদ্যম খুঁজে পায় এবং কাজ করতে শুরু করে।

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণঃ মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . (القصص:٥٠)

'অত:পর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . (الجاثية:٢٣)

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পরদা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না?' বিদআত অনুসৃত প্রবৃত্তির বুনন বৈ কিছুই নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বিচারক হিসেবে মানা থেকে সতর্ক করা সম্বন্ধে কয়েক গ্রন্থাগারের মন্তব্যঃ (গাযালী) 'এহইয়াউ 'উলুমিদ্দীন' (إحياء علوم الدين) গ্রন্থে বলেনঃ যেমনিভাবে ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি করতে বিবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যদিও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়, তেমনিভাবে বিবেক আখিরাতে যা উপকার করবে তা জানতে অপারগ, কারণ সেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করার সুযোগ নেই। এটা শুধু সম্ভব হবে যদি আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক মৃতব্যক্তি ফিরে আসে এবং তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে এমন আমল ও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আমল সম্পর্কে জানিয়ে দেয়; আর এটা আশা করার কোনো সুযোগ নেই।

(২) 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, একলোক ঈদের দিন ময়দানে ঈদের সালাতের আগে কিছু সালাত আদায় করতে চাইলে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে নিষেধ করেন। তখন লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি অবশ্যই জানি যে আল্লাহ আমাকে সালাত আদায় করার কারণে আযাব দিবেন না, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আর আমিও জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ

তা‘আলা যে কোনো কাজেরই সাওয়াব দেন না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন বা তিনি তা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। সুতরাং তোমার সালাত বেহুদা কাজ হয়ে যাবে, আর বেহুদা কাজ করা হারাম। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর বিরোধিতার কারণে তোমাকে শাস্তি দিবেন।”।

(৩) ‘আল - হিদায়া’ গ্রন্থকার বলেন: “সুবহে সাদিকের পরে ফযরের দুই রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করা মকরূহ; কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই রাকাতের বেশি আদায় করেননি।”

সুতরাং লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইবাদত অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে মাকরূহের উপর দলিল হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন। [তথ্যসূত্রঃ সংকলন: শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]।[50]

[50] শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম,

(৩) ব্যক্তি ও মতের পক্ষাবলম্বনঃ সত্যাসত্য যাচাই না করে কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মতের পক্ষাবলম্বন করা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে সঠিক দলিলের অনুসরণ ও হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। ব্যক্তি ও দলিলের আনুগত্যের মাঝে সেই পক্ষাবলম্বন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ . (البقرة:১৭০)

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে হুকুমের অনুসরণ কর যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না: জানতো না সঠিক পথও।'

বর্তমান যুগেও এ প্রকৃতির অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী যেমনঃ কবর পূজারি বা প্রচলিত

তথাকথিত মাযহাবপন্থীরা। অতএব, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা যে মতাবলম্বী এবং যে ব্যক্তির দর্শন গ্রহণ করেছে যদি সে মত ও দর্শনের বিপরীত কোরআন ও হাদীসের সঠিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাদের বলা হয়, আপনি যে মত ও দর্শন গ্রহণ করেছেন সেগুলো তো কোরআনের এ আয়াত ও এ সকল হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই ইমাম গাযালী (রহঃ) তাঁর 'আল-আরবা'ঈন ফী উসূলিদ্দীন' (الأربعين في أصول الدين) নামক গ্রন্থে বলেন, "তুমি অবশ্যই বেঁচে থাক তোমার বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবকিছু বিচার করা থেকে, আরও বেঁচে থাক 'প্রত্যেক কল্যাণকর ও উপকারী বস্তুই উত্তম, আর যা কিছু অধিক পরিমাণে হবে, তাই অধিক উপকারী হবে' এমন কথা বলা থেকে। কারণ, তোমার বুদ্ধি স্রষ্টার নির্দেশাবলীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম নয়; বরং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তিই অনুধাবন করতে পারে; সুতরাং তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল অনুসরণ করা; কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুমি কিয়াসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে না; তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

সালাতের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে অথচ গোটা দিনব্যাপী তা আদায় করা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুবহে সাদিক ও আসরের পরে এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার সময়; আর এটার পরিমাণ হচ্ছে দিনের এক তৃতীয়াংশের মত সময়।”

সুতরাং উক্ত মত ও পথ ছাড়ুন এবং কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সঠিক পথে ফিরে আসুন। তখন তারা নিজ মাজহাব মাশায়েখ ও বাপ-দাদার মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলে যে, এতকাল যাবৎ তারা কি ভুল করে এসেছে?

যুগ যুগ ধরেই তো এ আমল চলে আসছে। কই কেউ তো ভুল বলেনি? আমাদের পীর-বযুর্গরা এত বড় আলেম, তারা কি ভুল করতে পারে? ইত্যাদি যতসব অসার ও বাতিল কথা বলে মাযহাবপন্থীরা হককে এড়িয়ে যায়।

(৪) বিধর্মী কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বনঃ বেদআত ও কুপ্রথায় পতিত করার ব্যাপারে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন একটি বিরাট কারণ, যেমন আবু ওয়াক্বিদ লায়সী (রাঃ) এর হাদীসে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

(সাঃ) এর সাথে হোনাইন অভিমুখে যাত্রা করলাম। সে সময় সবে মাত্র কিছুদিন হলো আমরা কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, এদিকে 'যাতে আনওয়াত' নামে মুশরিকদের একটি বড়ই বৃক্ষ ছিল, যার চার পাশে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র সে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। পথিমধ্যে আমরা সে গাছের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের যেমন 'যাতে আনওয়াত' আছে আপনি আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' স্থির করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহু আকবার إنها السنن এটি একটি রীতি, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমরা তেমন একটি কথাই কললে যেমনটি বলেছিল, বনী ইসরাইলরা নবী (সাঃ) মূসা (আঃ) কে।

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. (الأعراف)

তারা বলতে লাগল, হে মুসা আপনি আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন তোমরা নিতান্তই একটি অজ্ঞতা প্রসূত সম্প্রদায়। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বসূরীদের রীতি অনুসরণ করবে। এ হাদীস নবী আকরাম (সাঃ) সুস্পষ্ট করে

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনা করছেন যে, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনই বনী ইসরাইলকে ইবাদতের জন্য মূর্তি নির্মাণ করে দেয়ার মত কদর্য অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর ঐ একই জিনিস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতিপয় সাহাবিকে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছ নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করতে উৎসাহ করে তুলছিল। বর্তমান সময়েও এমনটি ঘটে চলেছে যে অধিকাংশ মুসলমান শিরকি ও বিদ'আতী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবি উদযাপন, নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সপ্তাহ বা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে নেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষ ও স্মরণিকা স্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ, ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণ। কবরের উপর ঘর-গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

(৫) অন্ধভক্তি ও আনুগত্যঃ ইসলাম কখনো অন্ধ আনুগত্য সমর্থন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের দাবি করার পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। প্রশ্নবাণে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জর্জরিত করে ঈমান আনার ঘোষনা দিয়েছেন হযরত যিমাম ইবনে ছা'লাবা (বুখারী)। তবে ঈমান আনার পর কেবল কুরআন-সুন্নাহরই অন্ধভুক্তি ও আনুগত্য করা যায়। বজুর্গ,পীর-মাশায়েখ,অলি-আবদাল অন্ধ আনুগত্য পাওয়ার

http://islaminonesite.wordpress.com

হকদার নন। সত্যিকারের কোন বজুর্গ ব্যক্তি এমনটি দাবিও করেন নি। তাদের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ। কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী আদেশ-উপদেশই পালনীয়। কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোক ইসলামের এই শাশ্বত বিধানের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আমলের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে বজুর্গীর দোহাই দেন,অমুক বজুর্গ যদি 'বিদআত'করতে পারেন- তবে আমিও করব,অমুক পীর যদি 'বিদআত' করে জাহান্নামী হন তবে আমিও জান্নাত চাই না ইত্যাদি চরম ধৃষ্টতাপূর্ন কথা বলে ফেলেন। যা মুসলিম সমাজে 'বিদআতে'র প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

(৬) দীর্ঘদিন সুন্নাত বর্জনের কারণেঃ ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত, কুরআন-সুন্নাত সমর্থিত বা নির্দেশিত কোনো কাজ দীর্ঘদিন সমাজের দ্বিনদার পরহেজগার বুজুর্গ, আলেম উলামা,বুজুর্গ ব্যাক্তিগণ আমল করনেনি,বা বহুকাল ধরে তার প্রচারো করেননি, লোকেদর সামনে বহুকাল বলা হয়নি। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে ধারণা হয় যে,এ কাজ নিশ্চয়ই ভাল নয়। যদি ভালোই হতো তবে অবশ্যই তা পরহেজগার, দ্বিনদার, বুজুর্গানে দ্বীন,উলামায়ে কেরাম করতেন। ভাল কাজ হলে উলামা-মাশায়েখগণকি এতদিন বলতেন না? এভাবে একটি শরীয়াত সম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত লোকদের শরীয়াত বীরোধী মনে করতে

থাকে।সুন্নাতকেই হারাম,বিদাআত ইত্যাদি আখ্যায়িত করে ফেলে।আর করোণীয় কাজকে বর্জনীয় মনে করাও মস্ত বরো বিদআত। যেমন- ইসলামী রাজনীতি,সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম দীঘদিন উলামায়ে কেরামের মাঝে অনুপস্থিত থাকায় সাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলামে রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি করা হারাম (নাউযুবিল্লাহ)

(৭) নেতৃস্থানীয় জাহিল লোকদের কর্মতৎপরতাঃ দ্বীন সম্পর্কে জাহিল লোকেরা হয়ত কোন কাজ করতে আরম্ভ করল।

আলেম সমাজ তার প্রতিবাদ করলেন না,বাধাও দিলেন না। এ কাজ শরীয়াত বিরোধী,তোমরা মুসলামান হিসাবে এ কাজ কিছুতেই করতে পারো না ইত্যাদি কিছুই বললেন না। ফলে সাধাণত লোকদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, নিশ্চয়ই এ কাজ অবৈধ্য নয়। যদি অবৈধ হতো তবে উলামায়ে কেরাম বাধা দিতেন অমুক মজলিসে এমনি কাজ হয়েছে। ওখানে অমুক বড় বড় আলেম ছিলেন। কেই বাধা দেননি। অতএব এ কাজ শরীয়াত সম্মত। অবস্থা শেষ পযর্ন্ত এমন পর্যায়ে গিয়ে পোঁছে যে, একদিকে জনরোষের বয় অপর দিকে নিজেও দু’চার বার করে ফেলেছেন- এখন বাধা দিবেন কীভাবে? এমন কিছু সংখ্যক আলেম তাদের পক্ষে

দলিল-যুক্তি আবিষ্কার করতে থাকেন। তখন আবার কিছু সংখ্যক আলেম বাধা দিয়েও আর সমাজের জোয়ার ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে যান। বিদআতীগণ নিজেদের পক্ষে কিছু কিছু আলেমও পেয়ে যাওয়ায় তারা শরীয়াত বিরোধী কাজটি ত্যাগ করার প্রয়োজনও আর বোধ করেন না। তাদের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করা হয় যে, আলেমের কথায় কাজ করে যদি কোন গুনাহ হয়, তবে তার দায় ঐ আলেমেই বহন করবেন- যিনি তাকে বাতলিয়েছেন। সুতরাং তার কোন অস্থিরতার কারণই নেই। এভাবে সমাজ বিদআদ চালু হয়ে যায়।

(৮) আলেম সমাজের কাজ-কর্মঃ কোন আলেম হয়ত অসতর্কতার দরুন বা কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে শরীয়াত বিরোধী বা সুন্নাতের খেলাফ কোন কাজ করে ফেলেছেন। তিনি নিজেও জানেন যে, তার কাজ সুন্নাতের খেলাফ বা তার কাজের সমথর্নে ইসলামী শরীয়াতের গ্রহনযোগ্য কোন দলিল-প্রমাণ নেই। তিনি হয়তো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাওবাও করেছেন। কিন্তু তার কাজ দেখে জাহিল বা অতিভক্ত লোকেরা মনে করতে শুরু বিরোধী কোন কাজ করতেই পারেনা। কারণ মস্ত বড় আলেম-বুজুর্গ শরীয়াত বিরোধী কোন করতেই পারেন না। ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে জাহিল লোকেরা এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদআতের প্রচলন করে

http://islaminonesite.wordpress.com

ফেলে। সেজন্য বিজ্ঞজনেরা বলেন- حسناث اللابرار سيءات للمقر بين অর্থাৎ- “বুজর্গ ব্যক্তির ভাল কাজ ভক্তের জন্যে মন্দ হয়ে যায়”| বাধ্য হয়ে বুজর্গ ব্যক্তি যা করেছেন তা ছিল বুজর্গের জন্য হালাল। আর বুজর্গকে দেখে বিনা কারণেই যিনি বুজুর্গের অনুসরন করলেন, তিনি হলেন পাপী। সংশ্লিষ্ট বুজুর্গ হয়তো জানেন-ই না যে, তাকে নিয়ে এতো কিছু হয়েছে বা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ সাধারণত ঐ বুজর্গের ওফাতের পরই হয়ে থাকে। আবার এক শ্রেণীর আলেম সাধাণত জনগণের মধ্যে এমন একটি ধারণাও প্রচার করেন যে, বুজুর্গ ব্যক্তির ভুল ধরা বা বলাও পাপ (!) শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘনের পরও বলা হয়- তিনি মাদারজাত অলি(মাতৃগর্ভ হতেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা), তার ব্যাপারে শরীয়াতের সব হুকুম প্রযোজ্য নহে (!) বিদআতের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহনকারীদের আচারণও বিদআত সম্প্রসারাণে কার্যকার ভূমিকা পালন করে। সর্বমহলে নিজ অবস্থানকে গ্রহনযোগ্য করার মানসিকতা উদারনীতি গ্রহনে প্রাণ সঞ্চার করে। আবার ২/১ বার বিদআতী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন ঐ কাজেকে কীভাবেই বা বিদআত বলা যায়? উদারপন্থী এসব সম্মাণিত উলামা হযরত যদি তাদের যবান মোবারক দিআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার করতেন,তবে

http://islaminonesite.wordpress.com

কুসংস্কারের কড়াল গ্রাস হতে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পেয়ে প্রভূত উন্নতি সাধনে ব্রত হতো।

(৯) ইসলামী চেতনা, ঐতিহ্য ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্য : মুসলিম উম্মার মধ্যে গড়ে উঠা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষ মদদে বিদআদ সৃষ্টি করে তা সমাজে চালু করা হয়। একতাই শক্তি- একতাই বল। ঐক্যবদ্ধ কোন জাতিকে কোন অবস্থাতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ কথা ঐহিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত। মুসলিম সমাজে ইবাদতরূপে নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি করা হলে মূর্খ ও স্বার্থপর লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ পেয়ে ইসলামের মূল চেতনা হতে সরে আসবে,আর প্রকৃত দ্বীনদার ব্যক্তিরা কখনো বিদআত গ্রহন করবে না। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে শুরু হবে সংঘাত। অগ্রগতি দূরের কথা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে একে অন্যের দমনে শুরু নিজেরাই উদ্যোগী হবে না বরং ভিন্নমত পোষনকারী গোষ্ঠকে নির্মূর্ল করার জন্যে প্রয়োজনে অমুসলিমদের ডেকে আনবে। সৃষ্টি হবে বিভিন্ন দল-উপদলের। ফলে মুসলিম সমাজ কখনো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শান্তির সমাজ কায়েমের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। এমনই একটি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য স্বার্থবাদী,অনভিজ্ঞ কতিপয় নামধারী আলেম, তথাকথিত

http://islaminonesite.wordpress.com

পীর-মাশয়েখদের দূর হতে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী শক্তি। আর এভাবে সমাজে প্রচলিত হতে থাকে অসংখ্য বিদআদী বিদআদ। যার বাস্তব নমুনা আমরা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রত্যেক্ষ করছি।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এ কথা আমাদের জানা উচিত যে, বিদআতী কাজের ভিত্তি কি? বিভিন্ন বিদআতী কাজ সমাজে চালু হওয়ার পেছনে সাধারণ জনসাধারণ কেবল অনুসরণের দোষেরই দোষী। বিদআত সমাজে জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তেমন অবদান নেই। কিছু নামধারী আলেম, কতিপয় ভন্ড পীর সমাজে বিদআতের প্রবর্তন করে। এসব বিদআতগুলোকে সমাজে চালু করার জন্য প্রথমত কোন কোন আলেমের অসাধারণ ও বিস্ময়কর বজুর্গ ও ফজিলত তুলে ধরা হয়। কোন না কোন ভাবে তার বংশ নিয়ে টেকানো হয় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। দেয়া হয় 'আওলাদে রাসূলের (!) খেতাব। আবার কেউ নিয়ে বংশ টেকান মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বা অন্য কোন প্রখ্যাত ইমামের সাথে। (নাউযুবিল্লাহ)। অতঃপর ঐ বুজুর্গের বুজুর্গীর দোহাই দিয়ে বিদআত বাজারজাতকরণে প্রয়াস চালায়। বলা হয় অমুক বড় বুজর্গ এ কাজ করেছেন, তিনি অনেক বড় বড় আলেম, অলিয়ে কামেল ছিলেন সুতরাং এ কাজ জায়েজ

হওয়ার এটাই বড় দলিল (!)। কথিত বুজর্গের বাহারী টাইটলের আবর্তে অবুঝ শিশুর ন্যায় কিছু লোক ব্যাকুল হযে যায়। অতএব, হে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সমাজে প্রচলিত বিদআত হতে হেফাজত করুন এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

বিদ'আতের অপকারিতাঃ অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতেও থাকবে। কিন্তু সেই আবেগ যেন মুহব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়। যদি এমনটি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের নামে শয়তান তাকে ধোকায় ফেলেছে। অতএব, আর যে কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব ছাড়াই, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাজটি করেননি, তবে এমন

কাজের উদ্ভাবন করা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করে দেয়, কেননা তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন এবং তার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, আর যখন তিনি তা করেননি এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি, তখন বুঝা যায় যে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তা নিকৃষ্ট ও মন্দ বিদ‘আত।

তার দৃষ্টান্ত হল দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়া, কেননা, যখন কোনো কোনো সম্রাট তার উদ্ভাবন করে, তখন আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তারা তাকে মাকরূহ তথা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদি তার বিদ‘আত হওয়াটাই মাকরূহ তথা হারাম হওয়ার দলিল না হত, তাহলে বলা যেতো যে, এটা আল্লাহ তা‘আলার যিকির এবং মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা; সুতরাং তাকে জুম‘আর আযানের উপর কিয়াস করা যাবে কিংবা এটাও বলা যেতো যে এটাকে (দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়ার বিষয়টিকে) ব্যাপক নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

[﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴾] [الجمعة: ١٠]

http://islaminonesite.wordpress.com

“আর তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর।”

অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলার অপর ব্যাপক বাণী,

[(وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ) [فصلت: ٣٣

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় ...।” [সূরা হা-মীম-সিজদা, আয়াত নং – ৩৩]।কিন্তু আলেমগণ এটা বলেননি, বরং তারা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা যেমন সুন্নাত তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের চাহিদা থাকা ও প্রতিবন্ধক না থাকা সত্ত্বেও যদি তা পরিত্যাগ করেন তবে সে কাজ পরিত্যাগ করাটাও সুন্নাত। কারণ, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আ’র সালাতের ক্ষেত্রে আযানের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি দুই ঈদের সালাতের জন্য নির্দেশ দেননি, তখন দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত। আর কারও অধিকার নেই যে, সে তা বৃদ্ধি করবে এবং বলবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি হবে না; কারণ তাকে বলা হবে, এভাবে রাসূলদের দীনসমূহ বিকৃত হয়েছে এবং তাঁদের শরী‘আতসমূহ পরিবর্তন হয়ে

গেছে; সুতরাং দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই; কেননা, বিদ‘আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এ বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত নয়, সে ফাসিক অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে, বিদ‘আতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এই বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত বিষয়, সে ফাসিক ও বিদ‘আতকারী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ, ফিসক বা অবাধ্যতা বিদ‘আতের চেয়েও ব্যাপক; কেননা প্রত্যেক বিদ‘আতই ফিস্‌ক বা অবাধ্যতা, কিন্তু প্রত্যেক ফিস্‌ক বা অবাধ্যতাই বিদ‘আত নয়। অনুরূপভাবে এটাও বলা হয় যে, বিদ‘আত ফিস্‌ক তথা অবাধ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট; কারণ, যে ব্যক্তি বিদ‘আতপূর্ণ কাজ করে, সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি তার ধারণায়

বিদ‘আতের মাধ্যমে সে তাঁকে সম্মান করছে, কারণ সে মনে করে যে, তার প্রবর্তিত এ বিদ‘আত সুন্নাতের চেয়ে উত্তম ও সঠিক হওয়ার অধিক যুক্তিযুক্ত। এভাবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী বলে গণ্য হবে; কারণ শরী‘আত যা অপছন্দ করেছে এবং যা থেকে নিষেধ করেছে, সে তাকে উত্তম মনে করেছে; আর তা হল দীনের মধ্যে নতুন কিছুর প্রবর্তন করা; অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দীন হিসেবে পরিপূর্ণ এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে সম্পূর্ণ, যেমনটি তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন:

[(ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي) [المائدة: ٣

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম।

সুতরাং পরিপূর্ণতার উপর বৃদ্ধি করা এক ধরনের ত্রুটি এবং অতিরিক্ত আঙুলের মতই বেমানান। আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় হকপন্থীদের মতে, ইবাদতের ভাল ও মন্দ জানা

http://islaminonesite.wordpress.com

যাবে কেবল শরী'য়তের মাধ্যমে, আকল বা যুক্তির মাধ্যমে নয়; সুতরাং এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী'য়তে নির্দেশনা রয়েছে, তা উত্তম কাজ; আর এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী'য়তে নিষেধ করা রয়েছে, তা মন্দ কাজ। অতএব, এ কথাতো মুসলিমদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা বিদ'আতী কাজ-কর্ম করে ও তাদের নবীর মুহব্বতে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ কথা যেমন আল-কুরআনে এসেছে, তেমনি হাদীসেও আলোচনা করা হয়েছে। আমি অতি সংক্ষেপে এখানে বিদ'আতের কতিপয় পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করছিঃ

(১) বিদআত মানুষকে পথভ্রষ্ট করেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন তা হল হক্ক। এ ছাড়া যা কিছুধর্মীয় আচার হিসাবে পালিত হবে তা পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: হক আসার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? (সূরা ইউনূস, ৩২)[51]

---

[51] সূরা ইউনূস, ৩২

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সকল ধরনের বিদ‘আত পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

(২) বিদ‘আত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটায়ঃ কেননা বিদ‘আত অনুযায়ী কেউ ‘আমল করলে অবশ্যই সে এক বা একাধিক সুন্নাত পরিত্যাগ করে। উলামায়ে কিরাম বলেছেন: “যখন কোন দল সমাজে একটা বিদ‘আতের প্রচলন করে, তখন সমাজ থেকে কম করে হলেও একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।”

আর এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যখনই কোন বিদ‘আত ‘আমলে আনা হয়েছে তখনই সেই স্থান থেকে একটি সুন্নাত চলে গেছে বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদ আলফেসানীর মাকতুবাত থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি লিখেছেন: এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল ‘আপনারা বলেছেন: যে কোন বিদ‘আত নাকি একটি সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে। আচ্ছা, যদি মৃত ব্যক্তিকে কাফনের সাথে একটি পাগড়ী পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে কোন সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়? কি কারণে এটা বিদ‘আত বলা হবে?’ আমি জবাবে লিখলাম: অবশ্যই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয় যদি মৃতের কাফনে পাগড়ী দেয়া হয়। কারণ পুরুষের কাফনের সুন্নাত হল কাপড়ের

সংখ্যা হবে তিন। পাগড়ী পড়ালে এ সংখ্যা আর ‘তিন’ থাকেনা, সংখ্যা দাড়ায় ‘চার।’ অতএব, এটি বিদ’আত ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আরো বলা যায়, এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ল। ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এ সমস্যার জন্য এক পীর সাহেবের কাছে গেল। পীর সাহেব তাকে বললেন, তুমি এক খতম কুরআন বখশে দাও অথবা নির্দেশ দিলেন একটা মীলাদ দাও বা খতমে ইউনূসের ব্যবস্থা কর। সে তাই করল। ফলাফল কি দাড়াল? ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি দু‘আ রয়েছে যা ‘আমল করা সুন্নাত। বিদ‘আত অনুযায়ী ‘আমল করার কারণে সে সেই সুন্নাতটি পরিত্যাগ করল। জানার চেষ্টা করলনা যে, এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে সে মিলাদ, কুরআন খতম ইত্যাদি বিদ‘আতী কাজ করে আরও আর্থিক ঋণভারে জর্জরিত হলো।

রামাযানের শেষ দশ দিনের রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ১৫ শাবানে রাত জাগাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয় তেমনভাবে এ সুন্নাতী ‘আমলের প্রচলন দেখা যায় না বরং শবে কদরের মূল্যায়ন শবে বরাতকে করা হচ্ছে। ফরয সালাত আদায়ের পর সর্বদা জামাতবদ্ধ হয়ে

মুনাজাত করা একটি বিদ‘আত। এটা ‘আমল করার কারণে ফরয সালাত আদায়ের পর যে সকল যিকর-আযকার সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত আছে তা পরিত্যাগ করা হয়। আপনি দেখবেন এভাবে প্রতিটি বিদ‘আত একটি সুন্নাতকে অপসারিত করে উহার স্থান দখল করে নিয়েছে।

(৩) বিদ‘আত আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করেঃ এর জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের খৃষ্টান ধর্ম। তারা ধর্মের বিদ‘আত প্রচলন করতে করতে উহার মূল কাঠামো পরিবর্তন করে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে পথভ্রষ্ট হিসাবে অভিহিত হয়েছে। তাদের বিদ‘আত প্রচলনের কথা আল-কুরআনে উলেখ- করা হয়েছেঃ আর সন্ন্যাসবাদ! ইহাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রচলন করেছিল। আমি তাদের এ বিধান দেইনি। (সূরা হাদীদ, আয়াত নং - ২৭)[52]

সন্ন্যাসবাদ তথা বৈরাগ্যবাদের বিদ‘আত খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের প্রবর্তন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল; উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করলেই তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদন প্রয়োজন। এভাবে যারা ধর্মের

[52] সূরা হাদীদ, আয়াত নং - ২৭

বিদ‘আতের প্রচলন করে তাদের অনেকেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাতে নাজাত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের অন্য জাতির রসম-রেওয়াজ ও বিদ‘আত প্রচলন করে ধর্মকে এমন বিকৃত করেছে যে, তাদের নবীগণ যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে তাদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরা নিজেরাই চিনতে পারবেন না। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শিয়া সম্প্রদায় বিদ‘আতের প্রচলন করে দ্বীন ইসলামকে কিভাবে বিকৃত করেছে তা নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

(৪) বিদ‘আত ইসলামের উপর একটি আঘাতঃ যে ইসলামে কোন বিদ‘আতের প্রচলন করল সে মূলতঃ অজ্ঞ লোকদের মত এ কথা স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়, তাতে সংযোজনের প্রয়োজন আছে। যদিও সে মুখে এ ধরনের বক্তব্য দেয় না, কিন্তু তার কাজ এ কথার স্বাক্ষী দেয়। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা: আয়াত নং - ৩)[53]

[53] সূরা মায়িদা: আয়াত নং - ৩

http://islaminonesite.wordpress.com

(৫) বিদ‘আত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে খিয়ানাতের এক ধরনের অভিযোগঃ যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতের প্রচলন করল বা ‘আমল করল আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন “এ কথা বা কাজটি যে ইসলাম ধর্মের পছন্দের বিষয় এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন? তিনি উত্তরে ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ বলবেন। যদি ‘না’ বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম জানতেন। আর যদি ‘হ্যাঁ’ বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে,আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জানতেন, কিন্তু উম্মাতের মধ্যে প্রচার করেননি। এ অবস্থায় তিনি তাবলীগে শিথিলতা করেছেন। (নাউ‘যুবিল্লাহ!)

(৬) বিদ‘আত মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ও ঐক্য সংহতিতে আঘাত করেঃ বিদ‘আত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শত্রুতা ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একদল লোক মীলাদ বা মীলাদুন্নবী পালন করল। আরেক দল বিদ‘আত হওয়ায় তা বর্জন বা বিরোধিতা করল। যারা এটা পালন করল তারা প্রচার করতে লাগল যে, অমুক দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে

আনন্দিত হওয়া পছন্দ করে না। তাঁর গুণ-গান করা তাদের কাছে ভাল লাগেনা। তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই। যাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই তারা বেঈমান, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন। আর এ ধরনের প্রচারনায় তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়েএকে অপরের দুশমনে পরিণত হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদ‘আতকে গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ শিয়া ও সুন্নি এবং পরবর্তী কালে আরো শত দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কত প্রাণহানির ঘটনা ঘটল, রক্তপাত হল। তাই মুসলিম উম্মাহকে আবার একত্র করতে হলে সকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান ও বিদ‘আত বর্জনের জন্য অহিংস ও শান্তিপূর্ণপন্থায় পরম ধৈর্য্যের সাথে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে হবে সকল মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করে। কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন আচরণ করা যাবে না। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যা হক ও সত্য তা-ই শুধু টিকে থাকবে। আর যা বাতিল তা দেরীতে হলেও বিলুপ্ত হবে।

(৭) বিদ‘আত ‘আমলকারীর তাওবা করার সুযোগ হয় নাঃ

বিদ‘আত যিনি প্রচলন করেন বা সেই অনুযায়ী ‘আমল

http://islaminonesite.wordpress.com

করেন তিনি এটাকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন এ কাজে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন। যেমন আল্লাহ খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন তারা ধর্মের বৈরাগ্যবাদের বিদ'আত চালু করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেহেতু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদ'আতকে পাপের কাজ মনে করেন না, তাই তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করেন না এবং তাওবা করার সুযোগও হয় না। অন্যান্য পাপের বেলায় কমপক্ষে যিনি পাপে লিপ্ত হন তিনি এটাকে অন্যায় মনে করেই করেন। পরবর্তীতে তার অনুশোচনা আসে, এক সময় তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করেন। কিন্তুবিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির এ অবস্থা কখনো হয় না।

(৮) বিদ'আত প্রচলনকারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত পাবে নাঃ রাহমাতুলি–ল আলামীন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মাতের শাফায়াতের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে খুব আগ্রহী হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করার পর তিনি বহু গুনাহগার বান্দা-যাদের জন্য শাফাআত করতে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিবেন-তাদের জন্য শাফাআত করবেন। কিন্তু বিদ'আত প্রচলনকারীর জন্য তিনি শাফাআত করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেনঃ শুনে রেখ! হাউজে কাউছারের কাছে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করব। সেই দিন তোমরা আমার চেহারা মলিন করে দিওনা। জেনে রেখ! আমি সেদিন অনেক মানষু কে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাব। কিন্তু তাদের অনেককে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি বলবঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমার প্রিয় সাথী-সঙ্গী, আমার অনুসারী। কেন তাদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে? তিনি উত্তর দিবেনঃ আপনি জানেন না যে, আপনার চলে আসার পর তারা ধমের্র মধ্যে কি কি নতুন বিষয় আবিস্কার করেছে। (ইবনে মাজাহ) অন্য এক বর্ণনায় আছে এর পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের উদ্দেশে বলবেন: দূর হও! দূর হও!!

(৯) বিদ‘আত মুসলিম সমাজে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়ঃ কুরআন ও সুন্নাহ হল মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের রক্ষা কবচ। ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বের একমাত্র উপাদান। তাইতো বিদায় হজ্জেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে রাখবে ততক্ষণ বিভ্রান্ত হবে না। বিদ‘আত অনুযায়ী ‘আমল করলে কুরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা মানুষের অন্তর থেকে কমে যায়।

‘যে কোন নেক ‘আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে’ – এ অনুভূতি মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

(১০) বিদ‘আত প্রচলনকারী অহংকারের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে ও নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার ও বিকৃত করতে চেষ্টা করেঃ বিদ‘আত প্রচলনকারী তার নিজ দলের একটি আলাদা কাঠামো দাঁড় করিয়ে ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এমন কাজের প্রচলন করে থাকে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রূপ লাভ করলেও কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ সেই কাজটা যদি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে তার দলের আলাদা কোন বৈশিষ্ট থাকে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ‘আমল সকল মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদআত ও প্রচলিত কুসংস্কার সমূহঃ উপরোক্ত কাজসমূহ ব্যতীত আমাদের দেশে আরও বহু বিদ’আতী কাজ সংগঠিত হচ্ছে। তাই একজন খাঁটি মুসলিম কোন আমল সম্পাদনের আগে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে যে, তার কৃত আমলটি কুরআন ও

সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত কি না? কিন্তু আমাদের দেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন অনেক কাজ বা আমলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার সাথে শরীয়তে মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم) আমলের সাথে কোন মিল নেই। এমন উল্লখযোগ্য বিদ'আতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

(১) শবে মি'রাজ ও শবে-বরাত পালন করা।

(২) ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল এর অনুষ্ঠান করা।

(৩) প্রচলিত পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান যা শরীয়ত সম্মত নয়।

(৪) মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা

(৫) মৃত্যুর পর তৃতীয়, সপ্তম, দশম এবং চল্লিমতম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দুআ'র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(৬) ইসালে সওয়াব বা সাওয়ার রেসানী বা সওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৭) মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা।

(৮) উচ্চে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকর করা।

(৯) হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা।

(১০) মনগড়া তরীকায় পীরের মুরিদ হওয়া

(১১) ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সালাত শুরু করার আগে মুখে উচ্চারন করে নিয়ত পড়।

(১২) প্রসাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০/৪০/৭০ কদম হাঁটাহাঁটি করা বা জোরে কাশি দেওয়া অথবা উভয় পায়ে কেঁচি দেওয়া বা বেহায়াপনা।

(১৩) ৩টি অথবা ৭টি চিল্লা দিলে ১ হজ্জের সওয়ার হবে এমনটি মনে করা।

(১৪) সম্মিলিত যিকির বা যিকিরে নানা অঙ্গভঙ্গি করা।

(১৫) উত্তম যিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে সংকুচিত করে শুধু আল্লাহ, আল্লাহ বলা বা শুধু ইল্লাল্লাহু বা হু হু করা ইত্যাদি।

(১৬) দোয়া গান্জুল আরশ, দোয়া জামিলা, দোয়া সুরয়ানী, দোয়া আক্কাশাহ, দোয়া হিযবুল বাহার, দোয়া আমন, দোয়ায়ে হাবীব, আহাদ নামা, দরূদে তাজ, দুরূদে শাহী, দুরূদে তুনাজ্জিনা, দুরুদে আকবর, হফত্ হায়কল শরীফ, চেহেল কাফ, কাদহে মুআয্যাম, শশ কুফল, ইত্যাদি ওযীফা সমূহ গুরুত্বের সহিত পড়া। এ সব ওযীফা আমাদের দেশে বাস, ট্রেন, গাড়ী ও সাধারণ দোকান গুলিতে খুবই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় যা সাদা-সিধে অজ্ঞ মুসলিম ভায়েরা ক্রয় করে থাকেন। প্রয়োজন বশত দুঃখ-মুসিবতের সময় কাজে লাগিয়ে থাকে। অথচ ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই এবং সম্পূর্ণ বিদ'আত।

নিম্নে উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

(১) শবে মেরাজ রাত্রি উদযাপন করাঃ

রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিরাজে গমণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা এবং রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিতে শবে মিরাজের নামে এ রাত্রি উয্যাপন করা ও এতে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদআত। এমনিভাবে হিজরী নব বর্ষ পালন করা এবং এতে শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন দলীল নাই। তাছাড়া রজব মাস তথা শবে মেরাজ কে কেন্দ্র করে এবং ফজীলতপূর্ণ মনে করে এ মাসে বিভিন্ন ইবাদত করা বিদআত। এ মাসে ওমরাহ্ পালন করা। এটাকে রজবী ওমরাহ্ বলা হয়ে থাকে, বেশী করে নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখা, সবই বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা অন্যান্য মাসের উপর রজব মাসের আলাদা কোন ফজীলত নেই। এ মাসের ওমরাহ্, নামায, রোযা এবং অন্য কোন প্রকার ইবাদতে অন্য মাসের চেয়ে অতিরিক্ত কোন ছাওয়াব পাওয়া যায়না।[54] অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মি'রাজের সালাত ও বিদআত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারন

---

[54] তথ্যসূত্রঃ ড : শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী। দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত : জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

http://islaminonesite.wordpress.com

হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, “সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, ও তাবেয়ীন যদি কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোন ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই উক্ত আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে ‘আমাল বা ইবাদাত প্রচলন করলে তা হবে বিদআত। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “যে সকল ইবাদাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এর সাহাবাগণ করেন নি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না।”

শবে মেরাজের সালাত প্রসঙ্গেঃ ইমাম ইযযুদ্বীন ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, “এ প্রকার সালাত যে বিদআত তার একটি প্রমাণ হলো দ্বীনের প্রথম সারির ‘উলামা ও মুসলমানদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও শরীয়াহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় ‘আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা

সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেন নি ও কোন বৈঠকে এ বিষয়ে কোন আলোকপাতও করেননি। বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরীয়তে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দ্বীনের প্রথম সারির 'আলিমগণ ও মু'মিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা"। [তথ্যসূত্রঃ আত তারগীব 'আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯][55]

(২) মাহে শাবান ও শবে বরাত (شب براءت) করণীয় ও বর্জণীয় –

শবে বরাত আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানঃ শব ফারসি শব্দ। অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটিও মূলে ফারসি। অর্থ ভাগ্য। দুশব্দের একত্রে অর্থ হবে, ভাগ্য-রজনী। বরাত শব্দটি আরবী ভেবে অনেকেই ভুল করে থাকেন। কারণ বরাত বলতে আরবি ভাষায় কোন শব্দ নেই। যদি বরাত শব্দটি আরবী বারাআত শব্দের অপভ্রংশ ধরা হয় তবে তার অর্থ

[55] আত তারগীব 'আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে— সম্পর্কচ্ছেদ বা বিমুক্তিকরণ। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ অর্থটি এখানে অগ্রাহ্য, মেনে নেয়া যায় নাঃ

১. আগের শব্দটি ফারসি হওয়ায় বরাত শব্দটিও ফারসি হবে, এটাই স্বাভাবিক

২. শাবানের মধ্যরজনীকে আরবি ভাষার দীর্ঘ পরম্পরায় কেউই বারা'আতের রাত্রি হিসাবে আখ্যা দেননি।

৩. রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বাদরকে কেউ-কেউ লাইলাতুল বারাআত হিসাবে নামকরণ করেছেন, শাবানের মধ্য রাত্রিকে নয়।

মূলতঃ আরবী ভাষায় এ রাতটিকে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান শাবান মাসের মধ্য রজনী — হিসাবে অভিহিত করা হয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তাওবা নামেও পরিচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। (সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১)[56]

এখানে বারায়াতের অর্থ হল সম্পর্ক ছিন্ন করা। 'বারায়াত' মুক্তি অর্থেও আল-কুরআনে এসেছে যেমনঃ

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাবসমূহে? (সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪)[57]

আর 'বারায়াত' শব্দক যদি ফারসী শব্দ ধরা হয় তাহলে উহার অর্থ হবে সৌভাগ্য। অতএব শবে বরাত শব্দটার অর্থ দাড়ায় মুক্তির রজনী, সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী। অথবা সৌভাগ্যের রাত, যদি 'বরাত' শব্দটিকে ফার্সী শব্দ ধরা হয়।

শবে বরাত শব্দটাকে যদি আরবীতে তর্জমা করতে চান তাহলে বলতে হবে 'লাইলাতুল বারায়াত'। এখানে বলে রাখা

---

[56] সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১

[57] সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪

ভাল যে এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরবী ও ফারসী ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। যেমন 'গোলাম' শব্দটি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ হল কিশোর আর ফারসীতে এর অর্থ হল দাস। সার কথা হল 'বারায়াত' শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফারসী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ হবে সৌভাগ্য।

অতএব, হিজরী সনের ৮ম মাস হচ্ছে শাবান মাস। তার পরই আসে বছরের শ্রেষ্ঠ রামাযান মাস। সে হিসেবে মুসলিমের জীবনে এ মাসের যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। দীর্ঘ টানা একমাস তাকে সিয়াম সাধনা করতে করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক, শারিরিক ও আর্থিক প্রস্তুতি। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানে প্রস্তুতি স্বরূপ অন্য মাসের তুলনায় শাবান মাসে বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন। শাবানের মধ্যরাত্রির কি কোন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে? শাবান মাসের মধ্য রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ

http://islaminonesite.wordpress.com

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাযন ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাসে রোযা রাখতে দেখে নি। আর তাঁকে আমি শাবান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখি নি। (সহীহুল বুখারী)[58]।

সুতরাং শাবান মাসে আমরাও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বেশী বেশী করে রাখবো এবং আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দুআ করবো, তিনি যেন আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত হায়াত দান করেন এবং রামাযানের ফজীলত ও বরকত হাসিল করার তাওফীক দেন। আমীন।

আল-কুরআনে শবে বরাতের কোন উল্লেখ নেই

শবে বরাত বলুন আর লাইলাতুল বারায়াত বলুন কোন আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুজে পাবেন না। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোন আলোচনা নেই। সরাসরি তো দূরের কথা আকার ইংগিতেও নেই। অনেককে দেখা যায় শবে বরাতের গুরুত্ব আলোচনা করতে যেয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতসমূহ হলঃ

[58] সহীহুল বুখারী

http://islaminonesite.wordpress.com

حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (الدخان: ١-٤)

অর্থঃ হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমিতো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে। আমি তো সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। (সূরা দুখান, আয়াত – ১ - ৪)

শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন।

আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। কারণঃ

(এক) কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থঃ আমি এই কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকা (ফেরেশতাগণ) ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এই শান্তি ও নিরাপত্তা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কাদর, আয়াত - ১-৫)

অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

(দুই) সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসের লাইলাতুল কদরে। যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ

অর্থঃ রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন।

(তিন) অধিকাংশ মুফাচ্ছিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। শুধু মাত্র তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) এর একটা মত উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন বরকতময় রাত বলতে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে। তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে কদর অর্থ নেয়া চলবেনা।

(চার) উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হল তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হল কুরআন ও হাদীস সম্মত তাফসীর। সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা (তাফসীর বির-রায়) গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

(পাঁচ) সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাচ্ছিরে কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানের 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ শবে বরাত নেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেনঃ "কোন কোন আলেমের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা বাতিল ধারণা।"

অতএব এ আয়াতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' এর অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনের তারিখের রাত নয়।

(ছয়) ইকরামা (রঃ) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রচার করতে হবে এমন কোন নিয়ম-কানুন নেই। বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হল হকের দাবী। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে

থাকতে পারেন অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেয়াও অসম্ভব নয়।

(সাত) শবে বরাতের গুরুত্ব বর্ণনায় সূরা দুখানের উক্ত আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মাউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী এ ধারণাই পোষণ করেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা করেন না।

(আট) ইমাম আবু বকর আল জাসসাস তার আল-জামে লি আহকামিল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে লাইলালাতুন মুবারাকা দ্বারা মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য করা ঠিক নয় বলে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেনঃ লাইলাতুল কদরের চারটি নাম রয়েছে, তা হলঃ লাইলাতুল কদর, লাইলাতু

মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুস সিক। (তথ্যসূত্রঃ আল জামে লি আহকামিল কুরআন, সূরা আদ-দুখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুল বারাআত হল লাইলাতুল কদরের একটি নাম। শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের নাম নয়
ইমাম শাওকানী (রহঃ) তার তাফসীর ফতহুল কাদীরে একই কথাই লিখেছেন। (তাফসীর ফাতহুল কাদীরঃ ইমাম শাওকানী দ্রষ্টব্য)

এ সকল বিষয় জেনে বুঝেও যারা 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ করবেন শবে বরাত, তারা সাধারণ মানুষদের গোমরাহ করা এবং আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাতঃ শবে বরাত নামটি হাদীসের কোথাও উল্লেখ হয়নি প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামের কোন রাতের নাম খ্ুঁজে পাবেন না। যে সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হল 'লাইলাতুন নিস্ফ মিন শাবান' অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ

http://islaminonesite.wordpress.com

আল-কুরআনে নেই, হাদীসে রাসূলেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবলে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই। সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল 'আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে।

ফিকহের কিতাবের দৃষ্টিতে শবে বরাতঃ শুধু আল-কুরআনে কিংবা সহীহ হাদীসে নেই, বরং আপনি ফিক্হের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাবেন না। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলিতে ফিক্হের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মালাবুদ্দা মিনহু, নুরুল ইজাহ, কদুরী, কানযুদ্ দাকায়েক, শরহে বিকায়া ও হিদায়াহ খুলে দেখুন না! কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাওয়া যায় কিনা!

অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিকাহবিদগণ ইসলামের অতি সামান্য বিষয়গুলো আলোচনা করতেও কোন ধরনের কার্পণ্যতা দেখাননি। তারা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরী করেছেন কবর যিয়ারতের মত বিষয়েরও। শবে বরাতের ব্যাপারে

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম ইশারা থাকলেও ফিকাহবিদগণ এর আলোচনা মাসয়ালা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অতএব এ রাতকে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের মনগড়া বানানো একটি বিদ‘আত যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

শবে বরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা‘আলা এ রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিযক ও ভাগ্যের ফায়সালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল্লাহ হায়াত ও রিযক বাড়িয়ে সৌভাগ্যশালী করেন ইত্যাদি আকীদা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত অন্যায় নয় কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.

অর্থঃ তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? (সূরা সাফ, আয়াত নং -৭)

শবে বরাত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য এ শিরোনামে আমি শবে বরাত সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য আলেম শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এর প্রবন্ধ –

http://islaminonesite.wordpress.com

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

‘মধ্য শাবানের রাত উদযাপনের বিধান’ এর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরব। তার এ প্রবন্ধে অনেক উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. (المائدة : ٣)

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের জন্য আমার নেআমাত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, ৩)। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
(الشورى : ٢١)

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ২১)

হাদীসে এসেছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ যে আমাদের এ ধর্মে এমন কিছুর প্রচলন করবে যা দ্বীনের মধ্যে ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আরও এসেছেঃ

عن جابر رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (رواه مسلم)

অর্থঃ সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর খুতবায় বলতেন ঃ আর শুনে রেখ! সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-নির্দেশ। আর ধর্মে নতুন বিষয় প্রচলন করা হল সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এবং সব ধরনের বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম)

http://islaminonesite.wordpress.com

এ বিষয়ে অনেক আয়াতে কারীমা ও হাদীস রয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কোন রকম অলসতা করেননি বা কার্পণ্যতা দেখাননি। ইসলাম ধর্মের সকল খুটিনাটি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর উম্মতের সামনে বর্ণনা করে গেছেন যা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যে সমস্ত নতুন আচার-অনুষ্ঠান, কাজ ও বিশ্বাস ধর্মের আচার বলে যা চালিয়ে দেয়া হবে তা সবগুলো প্রত্যাখ্যাত বিদ‘আত বলেই পরিগণিত হবে, তা উহার প্রচলনকারী যে কেউ হোক না কেন এবং উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক না কেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাদের পরবর্তী উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলে তারা বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও অন্যদের বিদ‘আতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কিরাম মধ্য শাবানের রাত উদযাপন ও ঐদিন সিয়াম পালন করাকে বিদ‘আত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ‘আমল করা যেতে পারে এমন কোন দলীল নেই। যা আছে তা হল কিছু দুর্বল হাদীস যার উপর ভিত্তি করে ‘আমল করা যায় না। উক্ত রাতে সালাত আদায়ের ফাযীলাতের যে সকল হাদীস

পাওয়া যায় তা বানোয়াট। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে রজব তার কিতাব লাতায়িফুল মায়ারিফে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

একটি কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, দুর্বল হাদীস ঐ সকল ‘আমল ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় যে সকল ‘আমল কোন সহীহ হাদীস দ্বারা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মধ্য শাবানের রাতে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ মূল নীতিটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

সকল উলামায়ে কিরামের একটি ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে যে, যে সকল ব্যাপারে বিতর্ক বা ইখতিলাফ রয়েছে সে সকল বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ন্যস্ত করা হবে। কুরআন অথবা হাদীস যে সিদ্ধান্ত দিবে সেই মোতাবেক ‘আমল করা ওয়াজিব। এ কথা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তাহলে আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে (ধর্মীয় জ্ঞানে ও শাসনের ক্ষেত্রে) ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা ন্যস্ত কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৫৯)। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) তার কিতাব লাতায়িফুল মায়ারিফে লিখেছেনঃ "তাবেয়ীদের যুগে সিরিয়ায় খালিদ ইবনে মা'দান, মকহুল, লুকমান ইবনে আমের প্রমুখ আলিম এ রাতকে মর্যাদা দিতে শুরু করেন এবং এ রাতে বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। তখন লোকেরা তাদের থেকে এটা অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এরপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হল; বসরা অঞ্চলের অনেক আবেদগণ এ রাতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মক্কা ও মদীনার আলিমগণ এটাকে বিদ'আত বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সিরিয়াবাসী আলিমগণ দুই ভাগ হয়ে গেলেন। একদল এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন খালেদ ইবনে মা'দান, লোকমান ইবনে আমের। ইসহাক ইবনে রাহভিয়াহও তাদের অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

আলেমদের অন্যদল বলতেনঃ এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করা মাকরূহ, তবে কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করলে তাতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আওযায়ী এ মত পোষণ করতেন।

মোট কথা হল, মধ্য শাবানের রাতের 'আমল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নয়। যা কিছু পাওয়া যায় তা তাবেয়ীগণের যুগে সিরিয়ার একদল আলেমের 'আমল।" বিশুদ্ধ কথা হল, এ রাতে ব্যক্তিগত 'আমল সম্পর্কে ইমাম আওযায়ী ও ইবনে রজব (রহঃ) এর মতামত যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত যা সহীহ নয়। আর এটাতো সকল আলেমে দ্বীনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, শরয়ীভাবে প্রমাণিত নয় তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক তা কোন মুসলিমের ধর্মীয় 'আমল হিসাবে পালন করা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীস হল আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি বলেছেনঃ

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (رواه مسلم

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ যে কেহ এমন 'আমল করবে যা করতে আমরা (ধর্মীয়ভাবে) নির্দেশ দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম) ইমাম আবূ বকর আত-তারতূশী (রহঃ) তার কিতাব (الحوادث والبدع) 'আল-হাওয়াদিছ ওয়াল বিদ'আ'তে উল্লেখ করেন ঃ ইবনে ওয়াদ্দাহ যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ আমাদের কোন উস্তাদ বা কোন ফকীহকে মধ্য শাবানের রাতকে কোন রকম গুরুত্ব দিতে দেখিনি। তারা মাকহূলের হাদীসের দিকেও তাকাননি এবং এ রাতকে অন্য রাতের চেয়ে 'আমলের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন না।

হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেনঃ মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীসগুলো বানোয়াট বা জাল এবং এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল। এ সম্পর্কে সকল উলামাদের মতামত যদি উল্লেখ করতে যাই তাহলে বিরাট এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে সত্যানুরাগীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের জন্য একত্র হওয়া, ঐ দিন সিয়াম পালন করা ইত্যাদি নিকৃষ্ট বিদ'আত। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটাই বলেছেন। এ ধরনের 'আমল

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেমন ছিল না তেমনি ছিল না তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর সময়ে। যদি এ রাতে ইবাদাত- বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সে সম্পর্কে সতর্ক ও উৎসাহিত করতে কার্পণ্য করতেন না, যেমন তিনি কার্পণ্য করেননি লাইলাতুল কদর ও রামাযানের শেষ দশ দিন ইবাদাত-বন্দেগী করার ব্যাপারে মুসলিমদের উৎসাহিত করতে। যদি মধ্য শাবানের রাতে অথবা রজব মাসের প্রথম জুমু‘আর রাতে বা মি’রাজের রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অবশ্যই দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর তিনি যদি দিক-নির্দেশনা দিতেন তাহলে তার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কোনভাবেই তা গোপন করতেন না। তারা তা অবশ্যই জোরে শোরে প্রচার করতেন। তারা তো নবীগণের পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! চলমান শিরোনামে এতক্ষণ যা বলা হল তা ছিল শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বাযের বক্তব্যের সার কথা। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শবে বরাতের বিপক্ষে উলামাদের বক্তব্য উল্লেখ করলেন, কিন্তু শবে বরাত উদযাপনের পক্ষেও তো অনেক বিখ্যাত

http://islaminonesite.wordpress.com

উলামাদের বক্তব্য আছে তা তো উল্লেখ করলেন না। তাই ব্যাপারটা কি একপেশে ও ইনসাফ বহির্ভূত হয়ে গেল না? এর জবাবে আমি বলব ঃ দেখুন, কোন বিষয় বিদ‘আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য যথেষ্ট। কেননা কুরআন ও হাদীসে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক কাজটি বিদ'আত। তাই আলেমগণ যেটাকে বিদ‘আত বলে রায় দিবেন সেটা বিদ'আতই হবে। বিদ‘আত নির্ধারণের দায়িত্ব আলেমদের । কিন্তু কোন বিষয়কে ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব অথবা সওয়াবের কাজ বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের বক্তব্য যথেষ্ট হবে না যদি না উহার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সহীহ দলীল থাকে। অতএব কোন বিষয় বিদ‘আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে নয়।

আর এ কারণে আমরা শবে বরাত প্রচলনের সমর্থনে আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনা। এ বিবেচনায় যে সকল আলেম শবে বরাত উদযাপন করাকে বিদ‘আত বলেছেন তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে। যারা শবে বরাতের পক্ষে বলেছেন তাদের বক্তব্য এ জন্য গ্রহণ করা যাবে না যে, তা কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ দলীলে উত্তীর্ণ নয়।

শবে বরাত নামাযের প্রথম প্রচলনঃ এ নামাযের প্রথম প্রচলন হয় হিজরী ৪৪৮ সনে। ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের ইবনে আবিল হামরা নামীয় একলোক বায়তুল মুকাদ্দাস আসেন। তার তিলাওয়াত ছিল সুমধুর। তিনি শাবানের মধ্যরাত্রিতে নামাযে দাঁড়ালে তার পিছনে এক লোক এসে দাঁড়ায়, তারপর তার সাথে তৃতীয় জন এসে যোগ দেয়, তারপর চতুর্থ জন। তিনি নামায শেষ করার আগেই বিরাট একদল লোক এসে তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর এলে, তার সাথে অনেকেই যোগ দেয় ও নামায আদায় করে। এতে করে মাসজিদুল আক্সাতে এ নামাযের প্রথা চালু হয়। কালক্রমে এ নামায এমনভাবে আদায় হতে লাগে যে অনেকেই তা সুন্নাত মনে করতে শুরু করে। (ত্বারতুসীঃ হাওয়াদেস ও বিদআ পৃঃ ১২১, ১২২, ইবনে কাসীরঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৭, ইবনুল কাইয়েমঃ আল-মানারুল মুনিফ পৃঃ৯৯)[59]। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, এরাতে একশত রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। একশত রাকাত নামায পড়ার বিদআতটি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের

---

[59] ত্বারতুসীঃ হাওয়াদেস ও বিদআ পৃঃ ১২১, ১২২, ইবনে কাসীরঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৭, ইবনুল কাইয়েমঃ আল-মানারুল মুনিফ পৃঃ ৯৯

http://islaminonesite.wordpress.com

বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মাকদেসী (রহঃ) বলেনঃ “৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাকদিসে আমাদের নিকট ইবনে আবী হুমায়রা নামক একজন লোক আগমণ করলো। তার তেলাওয়াত ছিল খুব সুন্দর। অর্ধ শাবানের রাতে সে মসজিদে আকসায় নামাযে দাড়িয়ে গেল। তার পিছনে একজন এসে দাড়ালো। তারপর আরেকজন আসলো। এভাবে এক, দুই তিন করে নামায শেষ করা পর্যন্ত বিরাট এক জামাতে পরিণত হলো।” (দেখুন ال باعث على ان كار ال بدع وال حوادث ১২৪-১২৫) পরবর্তীতে মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযও চালু করে দেয়।

শবে বরাত নামাযের পদ্ধতিঃ প্রথা অনুযায়ী এ নামাযের পদ্ধতি হলো, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার করে পড়ে মোট একশত রাকাত নামায পড়া। যাতে করে সূরা ইখলাস ১০০০ বার পড়া হয়। (এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন (১/২০৩)[60]। এ ধরণের নামায সম্পূর্ণ বিদআত। কারণ এ ধরণের নামাযের বর্ণনা কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি। কোন কোন বইয়ে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয় সেগুলো কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি।

[60] এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন (১/২০৩

http://islaminonesite.wordpress.com

আর তাই আল্লামা ইবনুল জাওযী (মাওদুআত ১/১২৭-১৩০)[61], হাফেয ইরাকী (তাখরীজুল এহইয়া), ইমাম নববী (আল-মাজমু ৪/৫৬)[62], আল্লামা আবু শামাহ (আল-বায়স পৃঃ৩২-৩৬), শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা, (ইকতিদায়ে ছিরাতুল মুস্তাকীম ২/৬২৮), আল্লামা ইবনে আররাক (তানযীহুশ শরীয়াহ ২/৯২), ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল্লামা সূয়ূতী (আল-আমর বিল ইত্তেবা পৃঃ ৮১, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৫৭)[63], আল্লামা শাওকানী (ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আ পৃঃ ৫১)[64] সহ আরো অনেকেই এ গুলোকে "বানোয়াট হাদীস" বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

শবে বরাত নামাযের হুকুমঃ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণের মতে এ ধরণের নামায বিদআত; কেননা এ ধরনের নামায আল্লাহর রাসূলও পড়েননি। তার কোন খলীফাও পড়েননি। সাহাবাগণও পড়েননি। হেদায়াতের ইমাম তথা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, সাওরী, আওযায়ী, লাইসসহ অন্যান্যগণ কেউই এ ধরণের নামায পড়েননি বা পড়তে বলেননি। আর এ ধরণের নামাযের

---

[61] মাওদুআত ১/১২৭-১৩০

[62] আল-মাজমু ৪/৫৬

[63] আল-আমর বিল ইত্তেবা পৃঃ ৮১, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৫৭

[64] ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আ পৃঃ ৫১

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনায় যে হাদীসসমূহ কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন তা উম্মাতের আলেমদের ইজমা অনুযায়ী বানোয়াট। (এর জন্য দেখুনঃ ইবনে তাইমিয়ার মাজমুল ফাতাওয়া ২৩/১৩১,১৩৩,১৩৪, ইকতিদায়ে ছিরাতে মুস্তাকীম ২/৬২৮, আবু শামাহঃ আল-বায়েছ পৃঃ ৩২-৩৬, রশীদ রিদাঃ ফাতাওয়া ১/২৮, আলী মাহফুজ, ইবদা' পৃঃ ২৮৬,২৮৮, ইবনে বাযঃ আত্তাহযীর মিনাল বিদআ পৃঃ ১১-১৬)[65]।

ভ্রান্ত ধারনা ও সংশয় নিরসনঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই শাবান মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে প্রচলিত আছে সমাজের বিরাট এক অংশে শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে কিয়াম করা তথা নফল নামায পড়া এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার চিরাচরিত নিয়ম।

যদিও রাসূল (সাঃ) থেকে এই রাতের নফল নামায এবং দিনের বেলা রোযা রাখার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস

---

65 ইবনে তাইমিয়ার মাজমুল ফাতাওয়া ২৩/১৩১,১৩৩,১৩৪, ইকতিদায়ে ছিরাতে মুস্তাকীম ২/৬২৮, আবু শামাহঃ আল-বায়েছ পৃঃ ৩২-৩৬, রশীদ রিদাঃ ফাতাওয়া ১/২৮, আলী মাহফুজ, ইবদা' পৃঃ২৮৬,২৮৮, ইবনে বাযঃ আত্ তাহযীর মিনাল বিদআ পৃঃ ১১-১৬

http://islaminonesite.wordpress.com

পাওয়া যায়না। এ রাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে।

এ রাত সম্পর্কে মানুষের বিদআতী ধারণা এবং এ রাতে মানুষ যে সমস্ত বিদআতী আমল করে তার বিস্তারিত কিছু বিবরন নিম্মে উপস্থাপন করা হলঃ

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণাঃশবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হল, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের ৩নং আয়াতকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

"আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি" [66] এ বরকতপূর্ণ রাতই হল শবে বরাতের রাত। কতিপয় আলেম এভাবেই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের এব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হল লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরের রাত। যেমন অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা

[66] সূরা দুখান, আয়াত নং - ৩

হল, কুরআনের কোন অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা কদরের শুরুতে বলেন,

إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমি কুরআনকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদরঃ ১)[67] আর এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল ক্বদর রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে নয়।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা বাকারায় বলেন,-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

"রামাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)।[68] সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণাঃ শবে বরাতের ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে

---

[67] সূরা কদর, আয়াত নং - ১

[68] সূরা বাকারা, আয়াত নং - ১৮৫

http://islaminonesite.wordpress.com

থাকে, এরাতের শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং ক্বলব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দূর্বল। দেখুনঃ ইমাম আলবানীর তাহকীকসহ মিশকাত (১/২৮৯) হাদীস নং- ১২৯৯।[69]

ইমাম তিরিমিযী বলেন, "আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসটি যঈফ।" দেখুন তিরমিযী (২/২৫৯) হাদীস নং- ৭৪৪। নির্দিষ্টভাবে এ রাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহবান জানানোর হাদীসটি সুনানের কিতাবে যঈফ ও জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, "কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক

[69] ইমাম আলবানীর তাহকীকসহ মিশকাত (১/২৮৯) হাদীস নং- ১২৯৯

http://islaminonesite.wordpress.com

আছে কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন।” (দেখুন বুখারী, হাদীস নং- ১০৯৪, মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮।)[70]

সুতরাং জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীসের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আকীদা পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করা সম্পূর্ণ বিদআত। আরও বিস্তারিবতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. আলী (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ “১৫ শা’বানের রাতে তোমরা বেশী বেশী করে ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। এ রাতে আল্লাহ তা’আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেনঃ ‘কে আছো আমার কাছে গুনাহ মাফ চাইতে? আমি তাকে মাফ করতে প্রস্তুত। কে আছ রিযিক চাইতে? আমি তাকে রিযক দিতে প্রস্তুত। কে আছ বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে বিপদমুক্ত করতে প্রস্তুত। কে আছ ...’ এভাবে (বিভিন্ন প্রয়োজনের নাম নিয়ে) ডাকা হতে থাকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত”। (ইবনে মাজাহ

---

[70] বুখারী, হাদীস নং- ১০৯৪, মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে)।[71] এ হাদিসটি যে আদৌ সহীহ নয়, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম হাফেজ শিহাব উদ্দিন তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদীসটির সনদ যইফ (দুর্বল), কারণ হাদীসটির সনদের মাঝখানে আবু বকর বিন আবু সাবরা নামে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) অনির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইবনু মাইন তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেনঃ "লোকটি মিথ্যা হাদিস রচনা করে থাকে।" (দেখুনঃ সুনান ইবনে মাজাহ, মন্তব্য ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারী, পৃষ্ঠা ৪৪৪)।[72]

২. আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ "আমি এক রাতে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পাশে নেই। আমি উনার সন্ধানে বের হলাম। দেখি যে তিনি জান্নাতুল বাকী (কবর স্থানে) অবস্থান করছেন। ঊর্ধ্বাকাশপানে তাঁর মস্তক ফেরানো। আমাকে দেখে বললেন, 'আয়েশা, তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তোমার প্রতি অবিচার করেছেন?' আমি

[71] ইবনে মাজাহ

[72] সুনান ইবনে মাজাহ, মন্তব্য ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারী, পৃষ্ঠা ৪৪৪

http://islaminonesite.wordpress.com

বললাম, 'এমন ধারণা করিনি, তবে মনে করেছিলাম, আপনার অন্য কোন বিবির সান্নিধ্যে গিয়েছেন কিনা।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ১৫ই শা'বানের রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের সমুদয় বকরীর সকল পশমের পরিমাণ মানুষকে মাফ করে দেন।'" (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)[73]। ইমাম তিরমিজি হাদীসটি বর্ণনা করে নিজেই মন্তব্য করেছেনঃ আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত এই হাদিসটি হাজ্জাজ বিন আয়তাআহ্ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইমাম বোখারী বলেছেনঃ এ হাদিসটি যইফ (দুর্বল)। হাজ্জাজ বিন আয়তাআহ্ বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন আবি কাসির থেকে অথচ হাজ্জাজ ইয়াহতইয়া থেকে আদৌ কোন হাদিস শুনেননি। ইমাম বোখারী আরও বলেছেনঃ এমনকি ইয়াহ্ইয়া বিন আবি কাসিরও রাবী ওরওয়া থেকে আদৌ কোন হাদিস শুনেননি। (দেখুনঃ জামে' তিরমিজী, সাওম অধ্যায়, মধ্য শা'বানের রাত, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮)।[74]

৩. আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "১৫-ই শা'বানের রাতে আল্লাহ তা'আলা নিচে

---

[73] তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ

[74] জামে' তিরমিজী, সাওম অধ্যায়, মধ্য শা'বানের রাত, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮

নেমে আসেন এবং সকল মানুষকেই মাফ করে দেন। তবে মুশরিককে এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারীকে মাফ করেন না” (ইবনে মাজাহ)। এ হাদিসটির ব্যাপারে হাফেজ শিহাব উদ্দিন তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ এর সনদ যইফ (দুর্বল)। একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ বিন লাহইয়াহ্ নির্ভরযোগ্য নন। আরেকজন রাবী ওয়ালিদ বিন মুসলিম তাফলীসকারী (সনদের মাধ্যে হেরফের করেতে অভ্যস্ত) হিসেবে পরিচিত।

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আসসিন্দী বলেছেনঃ আরেকজন রাবী আদদাহহাক কখনও আবু মুসা থেকে হাদিস শুনেননি। শবে বরাত সংক্রান্ত বর্ণিত সবগুলো হাদিসের সনদের মধ্যেই এ জাতীয় দুর্বলতা বিদ্যমান থাকার কারণে একটি হাদিসও সহীহ’র মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে আগমণের বিশ্বাসঃশবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হল, এরাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রূহসমূহ দুনিয়াতে আগমণ করে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি একটি অবান্তর ধারণা যা কুরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

وَ مِنْ وَرَائِـهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুবাদ:- ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে কিয়ামত দিবস অবদি অবস্থান করবে। (সূরা মুমেনূনঃ ১০০)[75]।

এ রাত্রে মানুষের হায়াত, মউত ও রিযকের বার্ষিক ফয়সালা ভাগ্য লিখা হয় বলে ধারণাঃ তাদের এধারণাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীছের কোন দলীল নেই। সহীহ হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,-

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অনুবাদঃ "আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুকের তাকদীর লিখে রেখেছেন। (সহীহ মুসলিম)[76]। শবে বরাতে মনুষের হায়াত, মউত ও রিযকের বার্ষিক ফয়সালা হওয়া সংক্রান্ত যে হাদিসটি উসমান বিন মোহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। অর্থাৎ, হাদিসের প্রথম বর্ণনাকারী হিসাবে যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদিসটি শুনেছেন, তার কোন উল্লেখ নেই। ফলে এমন দূর্বল হাদিস দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদিসের অকাট্য

---

[75] সূরা মুমেনূনঃ ১০০

[76] সহীহ মুসলিম

http://islaminonesite.wordpress.com

বক্তব্যকে খণ্ডন করা যায়না। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬১)[77]। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ "বরকতময় রাত্রি বলতে ক্বদরতের রাতকে বোঝানো হয়েছে, যদিও কেউবা বলেছেন সেটা মধ্য শা'বানের রাত। ইকরামাও বলেছেন সেটি হচ্ছে মধ্য শা'বানের রাত। তবে প্রথম মতটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ 'আমি এই কুরআনকে লাইলাতুল ক্বদর-এ নাযিল করেছি।'" এ প্রসঙ্গে মানুষের হায়াত, মউত, রিযক, ইত্যাদির ফয়সালা শবে বরাতে সম্পন্ন হয় বলে যে রেওয়ায়েত এসেছে, সেটাকে তিনি অগ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। তিনি পূণরায় উল্লেখ করেনঃ "সহীহ-শুদ্ধ কথা হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর।" অতঃপর তিনি প্রখ্যাত ফকীহ কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতি পেশ করেনঃ জমহুর আলীমদের মতামত হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন এটা মধ্য শা'বানের রাত। এ কথাটি একেবারেই বাতিল। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর অকাট্য বাণী কুরআনে বলেছেনঃ "রমজান হচ্ছে ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" এখানে তিনি মাস উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর বরকতময় রাত বলে লাইলাতুল ক্বদরকে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যে

[77] তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬১

http://islaminonesite.wordpress.com

ব্যক্তি এ মাসটিকে রমজান থেকে সরিয়ে অন্য মাসে নিয়ে যায়, সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বসে। মধ্য শা'বানের রাতটির ফজিলত এবং এ রাতে হায়াত-মউতের ফয়সালা সংক্রান্ত কোন একটি হাদিসও সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই কেউ যেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ডঃ ১৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১২৮)[78]।

হালুওয়া রুটির রহস্যঃ তাদের বক্তব্য হচ্ছে শবে বরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) এর দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল। তাই নবী (সাঃ) শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুওয়া-রুটি খেয়েছিলেন।[79] তাই আমরাও নবীর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে হালুওয়া-রুটি খেয়ে থাকি। এটি একটি কাল্পনিক কথা। কারণ ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে, শাবান মাসে নয়। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় আজকাল বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে মারাত্মক অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয়

---

[78] তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ডঃ ১৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১২৮

[79] বইটির মূল লেখক: ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী -দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:-

لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের ('ঈসা ইবনু মারইয়াম- এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো- "আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল"।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডনঃএরাতে রাসূল (সাঃ) বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এরাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এ মর্মে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

শাবানের মধ্যরাত্রির পরদিন কি রোযা রাখা যাবেঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ،

تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

আহমদ ইবন আম্বল – আব্দুল্লাহ্ ইবন কায়স আয়েশা (রাঃ) - কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন।(তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ :: সাওম বা রোজা অধ্যায় ১৪, হাদিস ২৪৩১|)| অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শাবান মাসে সবচেয়ে বেশী রোযা রাখতেন। (এর জন্য দেখুনঃ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, ১৯৭০, মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬, ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২০৭৭, সুনানে তিরমিঝি, হাদীস নং ৬৫৭)[80]|

সে হিসাবে যদি কেউ শাবান মাসে রোযা রাখেন তবে তা হবে সুন্নাত। শাবান মাসের শেষ দিন ছাড়া বাকী যে কোন দিন রোযা রাখা জায়েয বা সওয়াবের কাজ। তবে রোজা

---

80 বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, ১৯৭০, মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬, ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৮, সুনানে আবু দাউদ , হাদীস নং ২৪৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা , হাদীস নং ২০৭৭, সুনানে তিরমিঝি, হাদীস নং ৬৫৭

http://islaminonesite.wordpress.com

রাখার সময় মনে করতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু শাবান মাসে রোজা রেখেছিলেন তাকে অনুসরন করে রোযা রাখা হচ্ছে অথবা যদি কারও আইয়ামে বিদের নফল রোযা তথা মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এ তিনদিন রোযা রাখার নিয়ম থাকে তিনিও রোযা রাখতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখা বিদআত হবে। কারণ শরীয়তে এ রোযার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

নিসফে শাবানের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহঃ) এর একটি ফতোয়াঃ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) কে নিসফে শাবানের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- এ রাতে কোন বিশেষ নামায আছে কি না? উত্তরে তিনি বলেনঃ অর্ধ শাবানের রাত সম্পকে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও যঈফ, যার কোন ভিত্তি নেই। আর এটি এমন রাত্রি যার অতিরিক্ত কোন মর্যাদা নেই। তাতে কুরআন পাঠ, একাকী কিংবা জামাত বদ্ধ হয়ে কোন নামায আদায় করা যাবে না। কতিপয় আলেম এই রাতের যে ফজীলতের কথা বলেছেন, তা দুর্বল। সুতরাং এ রাতের কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ঠ নেই। এটিই সঠিক কথা। আল্লাহ্ সকলকে তাওফীক দিন। (দেখুনঃ ইবনে বায (রঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

এর ফতোয়া সিরিজ প্রথম খন্ড) ।ইমাম আলবানী (রহঃ) বলেনঃ অর্ধ শাবানের রাতের ফজীলতে অনেকগুলো দুর্বল হাদীছ এসেছে। সবগুলো হাদীছ এক সাথে মিলালে সহীহর স্তরে পৌঁছে যায়। (দেখুন সিলসিলায়ে সহাহা, হাদীস নং- ১১৪৪)[81] তবে তিনি এ রাতে বিশেষ কোন এবাদত করাকে বিদআত বলে উল্লেখ করেছেন এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। (দেখুনঃ ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ)[82] ।

শবে বরাতের রোযাঃ শবে বরাতের রোযা রাখার প্রমাণ স্বরূপ দু'টি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রথম হাদীসঃ শাবান মাসের মধ্যরাত এলে তোমরা রাতে কিয়াম কর এবং দিনে সিয়াম পালন কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ) ।এই হাদীসের সনদে ইবনে আবু সাব্রাহ নামক একজন জাল হাদীস রচনাকারী রাবী থাকার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। (দেখুনঃ সিলসিলায়ে যাঈফা, হাদীস নং- ২১৩২)[83]

---

[81] সিলসিলায়ে সহাহা, হাদীস নং- ১১৪৪

[82] ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ

[83] সিলসিলায়ে যাঈফা, হাদীস নং- ২১৩২

দ্বিতীয় হাদীসঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সিরারে শাবানের রোযা রেখেছ? লোকটি বলল না। অতপর নবী (সাঃ) রামাযানের পরে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বললেন। (সহীহ মুসলিম) তারা এ হাদীস থেকে বুঝতে চেয়েছেন যে, এখানে সিরারে শাবান বলতে শবে বরাতের রোযা উদ্দেশ্য।অধিকাংশ আলেমদের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিল অথবা এটা তার মানতের রোযা ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয়ে সে রোযা রাখা ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ শাবান মাসের শেষের দিকে রামাযানের রোযার সাথে মিশিয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই রাসূল (সাঃ) তাকে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বলেছিলেন। [(দেখুন শরহুন্ নববী আলা সহীহ মুসলিম, (৪/১৮১)][84]

শবে বরাতের প্রচলনঃ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের এ আয়োজন শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনারব দেশসমূহেই দেখা যায়। প্রিয় পাঠক মন্ডলী! শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের দেশের রেডিও,

---

[84] শরহুন্ নববী আলা সহীহ মুসলিম, (৪/১৮১

টেলিভিশন, ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শবে বরাতের পক্ষে বিশেষ প্রচারণা চালনা হয় এমনকি ঐ দিন সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোন শরঈ ভিত্তি নেই। মুসলিম জাতির উচিৎ এ বিদআত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এ বিদআতকে বিদআতে হাসানাহ বলে থাকে। আসলে বিদআতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। ইসলামের নামে তৈরীকৃত সকল বিদআতই মন্দ, হাসানাহ বা ভাল বিদআত নামে কোন বিদআতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ

“প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম” (নাসাঈ)[85]

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, “সমস্ত বিদআতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে থাকে। (দেখুনঃ في الإبداع الابتداع وخطر الشرع كمال بيان পৃষ্ঠা নং ২১-২১)।

[85] নাসাঈ

http://islaminonesite.wordpress.com

অথচ আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সৌদি আরবে শবে বরাত পালনের কোন অস্তিত্বই দেখা যায়না। মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামগণের কেউ কোন দিন শবে বরাত উদ্যাপন করার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেন না। কারণ তারা ভাল করেই জানেন যে ইহা দ্বীনের কোন অংশ নয় বরং তা একটি নব আবিষ্কৃত বিদআত। এজন্যই তাঁরা শবে বরাতসহ অন্যান্য সকল বিদআত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে থাকেন এবং তাদের সকল জুমআর খুৎবা ও অন্যান্য আলোচনা ও ভাষণে বিনা শর্তে কুরআন-সুন্নার অনুসরণের আহবান জানান। সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আসুন আমরা ইবাদতের নামে এই নব আবিস্কৃত বিদআতকে পরিহার করি এবং অপরকে তা থেকে সাবধান করে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করি।

অতএব, কুরআন, হাদীস ও গ্রহণযোগ্য প্রখ্যাত আলেমদের উদ্ধৃত থেকে আমরা জানতে পারলাম শাবানের মধ্য রাত্রিকে ঘটা করে উদযাপন করা চাই তা নামাযের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যেমে অধিকাংশ আলেমদের মতে জগন্যতম বিদআত। শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবাদের যুগের পরে প্রথম শুরু হয়েছিল। যারা

সত্যের অনুসরণ করতে চায় তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তাই যথেষ্ট।

এবার প্রশ্ন আসে যইফ (দুর্বল) হাদিসের ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি-না। অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনের মতে যইফ হাদিসের উপর কোন আমল করা শরীয়তে জায়েয নেই। অধিকাংশ ফুকাহা আইম্মায়ে কেরাম যইফ (দুর্বল) হাদিস দ্বারা শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

•১। খুব বেশী যইফ (দুর্বল) পর্যায়ের না হওয়া।

•২। শুধুমাত্র ফাযায়েল অধ্যায়ের হওয়া। অর্থাৎ ফাজায়েল অধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন অধ্যায়ের যইফ হাদিসের ভিত্তিতে কোন প্রকার আমল করা যাবে না।

•৩। আমল করার সময় সহীহভাবে প্রমাণীত হওয়ার ধারনা না রাখা। অর্থাৎ, এ ধারণা রাখতে হবে যে হাদিসটি সহীহভাবে প্রমাণীত নয়।

• ৪। কুরআন ও সহীহ হাদিসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট যইফ হাদিসটি কুরআন বা সহীহ হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে শবে বরাতের আমল করা যেতে পারে বলে অনেক ওলামায়ে কেরাম মতামত দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন আসে আমল করতে হলে কিভাবে করা যাবে?

প্রথমতঃ ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইবাদত বন্দেগী করা যেতে পারে। সে জন্যে মসজিদে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার জন্য ওয়াজ নসীহত, যিকির ইত্যাদির আয়োজন করা যাবেনা। (দেখুনঃ ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদীন, পৃষ্ঠা ৬৪২)। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ এমনটি করেননি। তাই সে ত্বরিকার বাইরে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা আবিষ্কার করলে সেটা হয়ে যাবে বিদ’আত।

দ্বিতীয়তঃ হায়াত, মউত, রিযক ইত্যাদির ফয়সালা এ রাতে হয়, এটা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, এসব ফয়সালা যে

http://islaminonesite.wordpress.com

লাইলাতুল ক্বদরে হয়, তা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণীত।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আলোকসজ্জা ও আতশবজির যে তামাশা করা হয়, তা প্রকাশ্যে বিদ'আত। সে ধারণা থেকে কোন এলাকায় এ রাতের নাম হচ্ছে বাতির রাত। এ সব ধারণা ইসলামী শরীয়তে হিন্দুদের দিওয়ালী অনুষ্ঠান থেকে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)। হালুয়া-রুটি বিলি-বণ্টনের কার্যক্রমও বিদ'আত। (দেখুনঃ ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদীন, পৃষ্ঠা ৬৪২)। ইবাদতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব অনেক আমল শিয়াদের কাছ থেকে উপ-মহাদেশের মুসলমানরা গ্রহণ করেছেন বলে মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানী উল্লেখ করেছেন। (দেখুনঃ সাত মাসায়েলঃ শবে বরাতে শিয়াদের ভ্রষ্টতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২)[86]।

---

[86] সাত মাসায়েলঃ শবে বরাতে শিয়াদের ভ্রষ্টতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২

http://islaminonesite.wordpress.com

চতুর্থতঃ নফল ইবাদতের জন্য সারা রাত মসজিদে এসে জেগে থাকা রাসূল (সাঃ) - এর সুন্নত বিরোধী। তিনি নফল ইবাদত ঘরে করতে এবং ফরয ইবাদত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করতে তাগিদ করেছেন। আর সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করাটাও সুন্নত বিরোধী। প্রিয় নবীজী (সাঃ) সব রাতেরই কিছু অংশ ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমাতেন। উনার জীবনে এমন কোন রাতের খবর পাওয়া যায়না, যাতে তিনি একদম না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে ইবাদত করেছেন।

পঞ্চমতঃ শবে বরাতের দিনের বেলায় রোযা রাখার হাদিস একেবারেই দুর্বল। এর ভিত্তিতে আমল করা যায় না বলে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের সুস্পষ্ট ফাতাওয়া রয়েছে। শবে বরাত, কবর যিয়ারত, ইত্যাদি অনেক আমলেরই কোন সহীহ দলিল না থাকার কারণে উপমহাদেশর প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়নবী, হাক্কীকুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) - এর সাথে বহু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

শেষের দিকে কিছু কিছু বিষয় অবশ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

ষষ্ঠতঃ শবে বরাতের রোযার পক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলিল নেই, তাই যারা নফল রোযা রাখতে চান, তারা আইয়ামে বীজের তিনটি রোযা – ১৩, ১৪, ১৫ – রাখতে পারেন। এর পক্ষে সহীহ হাদিসের দলিল রয়েছে। শুধু একটি না রেখে এ তিনটি বা তার চেয়েও বেশী রোযা রাখতে পারলে আরও ভাল। কারণ, শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নফল রোযা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুণ। আমীন এবং সমস্ত নব্য আবিষ্কৃত বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযত রাখুন।

শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পর্যালোচনাঃ ১ নং হাদীস

১- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضى

http://islaminonesite.wordpress.com

الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.

قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن كثير لم يسمع من عروة، قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن كثير، انتهى كلامه، فهذا السند منقطع بوجهين.

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে আহমাদ ইবনে মুনী’ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেনঃ আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলাম না তাই আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম, ‘বাকী’ নামক কবরস্থানে তাকে পেলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি আশংকা করেছো যে আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি মনে করেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর

কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর কালব গোত্রের পালিত বকরীর পশমের পরিমানের চেয়েও অধিক পরিমান লোকদের ক্ষমা করেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ আয়িশা (রাঃ) এর এই হাদীস আমি হাজ্জাজের বর্ণিত সনদ (সূত্র) ছাড়া অন্য কোনভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর উরওয়াহ থেকে হাদীস শুনেননি। এবং মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ হাজ্জাজ ইয়াহ্ইয়াহ ইবনে কাসীর থেকে শুনেননি। এখানে শুনেননি অর্থ হচ্ছে বয়সের পার্থক্যের হিসেবে একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি বলে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) যে হাদীসটিকে সহীহ বলেন নি বরং বলেছেন রাবীদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে সেখানে এ হাদীসটি গ্রহনের আর কোন সুযোগই থাকছে না।[87]

অতএব, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুটো দিক থেকে মুনকাতি অর্থাৎ উহার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। অপর

[87] বিদ'আত – মোসাদ্দেক আহমদ, পৃষ্ঠা নং – ১১২

http://islaminonesite.wordpress.com

দিকে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল বলে পরিচিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা শবে বরাতের বেশী বেশী ফাযীলাত বয়ান করতে অভ্যস্ত তারা তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন তাদের এ মন্তব্যটুকু গ্রহণ করতে চাননা। এ হাদীসটি 'আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম তিরমিযীর এ মন্তব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে কি প্রমাণিত হয়? আমরা যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে মাসজিদে একত্র হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করি তাদের 'আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়?
বরং এ হাদীসে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়িশা (রাঃ) কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেন না বা সালাত আদায় করতে বললেন না।
অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামাযানের শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন।

বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোন ইবাদাত করার ফাযীলাত থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আয়িশাকে (রাঃ) বললেন না? কেন রামাযানের শেষ দশকের মত সকলকে জাগিয়ে দিলেন না, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোন অলসতা বা কৃপণতা করেননি।

২ নং হাদীস

عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود، حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله، لكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان
إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هو. (رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا حديث مرسل لأن علاء ما سمع عن عائشة)

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ আলা ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ এক রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদাহ এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি এ অবস্থা দেখে দাড়িয়ে তার বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম, আঙ্গুলটি নড়ে উঠল। আমি চলে এলাম। সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ হে আয়িশা অথবা বললেন হে হুমায়রা! তুুমি কি মনে করেছ আল্লাহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছেন? আমি বললামঃ আল্লাহর কসম হে রাসূল! আমি এমন ধারণা করিনি। বরং আমি ধারণা করেছি আপনি না জানি ইন্তেকাল করলেন!

অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং রাহমাত প্রার্থনাকারীদের রহম করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। (বাইহাকী তার শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন)। হাদীসটি মুরসাল। সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। কেননা বর্ননাকারী 'আলা' আয়িশা (রাঃ) থেকে

http://islaminonesite.wordpress.com

শুনেননি। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, এ হাদীসটি কোন হাদীস গ্রন্থের হাদীস নয়। মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভারতীয় ভাষ্যকার এর রচিত উদ্ধৃতি এটি বর্নীত হলেও এখানে কোন রাবীর উল্লেখ নেই। অতএব, এসব হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নাবী করিম (সাঃ) এর কবরস্থানে সিজদারত থাকার বিষয়টি কতটুকু গ্রহনযোগ্য তা বিশ্লেষকগণই ভালো বিবেচনা করার সুযোগ রাখেন কারন রাসূল (সাঃ) বারংবার বলেছেন যে, তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তর করো না। তাই কবরস্থানে তাঁর সিজদারত থাকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। আর বর্নীত হাদীসটি সনদের দিক থেকেও অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা উপরেও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন, আমীন।

৩ নং হাদীস

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينـزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. (رواه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث ضعيف لأن في سنده ابن أبي سبرة وهو معروف

http://islaminonesite.wordpress.com

بوضع الحديث عند المحدثين. المرجع : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وقال ناصر الدين الألباني في هذا الحديث: إنه واه جداً)

অর্থঃ আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেনঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযক প্রার্থনাকারী আমি রিযক দান করব। আছে কি কোন বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থ্যতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

প্রথমতঃ এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদে (সূত্রে) ইবনে আবি সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।

দ্বিতীয়তঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে নুযুল নামে পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفرله. (أخرجه البخاري ومسلم)

অর্থঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলতে থাকেনঃ কে আছ আমার কাছে দু‘আ করবে আমি কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

আর উল্লিখিত ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে আসেন ও বান্দাদের দু‘আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এই সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা প্রতি

http://islaminonesite.wordpress.com

রাতের শেষের দিকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দু'আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী এবং মুসলিম ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। অতএব এই মশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ৩ নং হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে।

কেহ বলতে পারেন যে, এই দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন মধ্য শাবানের রাতের শুরু থেকে। আর এ হাদীসের বক্তব্য হল প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতএব দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে কারণে ৩ নং হাদীসকে পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি বলব আসলেই এ দু হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। কেননা আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে আসেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মত শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে আসেন। কিন্তু ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল শাবান

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসের পনের তারিখের রাতের প্রথম প্রহর থেকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৪ নং হাদীস

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد : هل من مستغفر فأغفرله، هل من سائل فأعطيه ، فلا يسأل أحد إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك. (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ٦٥٢)

অর্থঃ উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়ঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেহ কিছু চাইবার আমি তাকে তা দিয়ে দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুশরিক ও ব্যভিচারী বাদে সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়। (বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) হাদীসটিকে তার সংকলন 'যয়ীফ আল-জামে' নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

শবে বরাত সম্পর্কে এ ছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেনঃ এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

শাবানের মধ্যরজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা-

শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হল। আমি মনে করি এ সম্পর্কে যত হাদীস আছে তা এখানে এসেছে। বাকী যা আছে সেগুলোর অর্থ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। এ সকল হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে পারি।

(১) এ সকল হাদীসের কোন একটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, ১৫ শাবানের রাতে আল্লাহ তা'আলা আগামী এক বছরে যারা ইন্তেকাল করবে, যারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কি খাবে সেই ব্যাপারে ফায়সালা করেন। যদি থাকেও তাহলে তা আল-কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল-কুরআনের স্পষ্ট কথা হল এ বিষয়গুলির ফায়সালা হয় লাইলাতুল কদরে।

(২) এ সকল হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, এ রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাদের গৃহে আসে। বরং এটি একটি

প্রচলিত বানোয়াট কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কোন সময় গৃহে ফিরে আসার ধারণাটা হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস।

(৩) এ সকল হাদীসের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে গোসল করেছেন, মাসজিদে উপস্থিত হয়ে নফল সালাত আদায় করেছেন, যিক্র-আযকার করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, সারারাত জাগ্রত থেকেছেন, ওয়াজ নাসীহাত করেছেন কিংবা অন্যদের এ রাতে ইবাদাত বন্দেগীতে উৎসাহিত করেছেন অথবা শেষ রাতে জামাতের সাথে দু'আ-মুনাজাত করেছেন।

(৪) এ হাদীসসমূহের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতের সাহরী খেয়ে পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেছেন।

(৫) আলোচিত হাদীসসমূহে কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে হালুয়া-রুটি বা ভাল খানা তৈরী করে বিলিয়েছেন, বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে মীলাদ পড়েছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৬) এ সকল হাদীসের কোথাও নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে' কিরাম (রাঃ) এ রাতে দলে দলে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করেছেন কিংবা কবরে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ বাদ দিলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসেও কি এর কোন একটা ‘আমল পাওয়া যাবে? যদি না যায় তাহলে শবে বরাত সম্পর্কিত এ সকল ‘আমল ও আকীদা কি বিদ’আত নয়? এ বিদ’আত সম্পর্কে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করার দায়িত্ব কারা পালন করবেন? এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আলেম-উলামাদের, দ্বীন প্রচারক, মাসজিদের ইমাম ও খতীবদের। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ইশারা নেই সে সকল ‘আমল থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরীদের তথা উত্তম আলেমদের।

ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কিত একটি হাদীস ও উহার পর্যালোচনাঃ “শবে বরাতে সৌভাগ্য বা এক বছরের তাকদীর লেখা সম্পর্কিত কোন হাদীস নেই” বলে আপনি যে দাবী করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ‘মিশকাত আল-মাসাবীহ’ কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত হাদীসটির পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরলাম। হাদীসটি হলঃ

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: هل تدرين ما هذه الليلة؟ يعني ليلة النصف من شعبان.
قالت ما فيها يا رسول الله ؟ فقال : فيها أن يكتب كل مولود
(من) بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني
آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم.
من مشكاة المصابيح في باب قيام شهر رمضان، رواه البيهقي
في الدعوات الكبير.

অর্থঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি কি জানো এটা (অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত) কোন্ রাত? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ রাতে কি রয়েছে? তিনি বললেনঃ এ রাতে এই বছরে যে সকল মানব-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করা হয়, যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের তালিকা তৈরী হয়, এ রাতে ‘আমলসমূহ পেশ করা হয়, এ রাতে রিযিক নাযিল করা হয়।

আলোচ্য হাদীসটি আল-মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে ‘রামাযান মাসে কিয়াম’ (রামাযান মাসের রাতের সালাত) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, ইমাম

http://islaminonesite.wordpress.com

বাইহাকী (রঃ) তার 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির পর্যালোচনা নিুে তুলে ধরলামঃ

(এক) উল্লিখিত হাদীসে 'অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত' বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নয়। এ বাক্যটি পরবর্তী কালের বর্ণনাকারীর নিজস্ব বক্তব্য বলে। আর আয়িশা (রাঃ) এমন কোন অজ্ঞ মহিলা ছিলেন না যে তাকে তারিখ বলে দিতে হবে।

(দুই) এ হাদীসে বর্ণিত 'অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত' কথাটি আয়িশার (রাঃ) বক্তব্য নয়। কারণ তার বক্তব্য শুরু হয়েছে 'তিনি জিজ্ঞেস করলেন' বাক্যটির পর। তাহলে এ বক্তব্যটি কার? এ বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়িশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব মন্তব্য, যা মেনে নেয়া আমাদের জন্য যরুরী নয়।

(তিন) এ হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হাদীসে ভাগ্য লেখার বিষয়টি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জন্ম, মৃত্যু, 'আমল পেশ, রিযক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী রামাযান মাসে লাইলাতুল কদরে স্থির করা হয়। এ কথা যেমন কুরআনের একাধিক

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(চার) আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক বিষয়টি ভালভাবে বুঝেছেন বলে তিনি হাদীসটিকে রামাযান মাসের সালাত (কিয়ামে শাহরি রামাযান) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল যে, তার মত হল হাদীসটি রামাযান মাসের লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত। যদি তিনি বুঝতেন যে, হাদীসটি মধ্য শাবানের তাহলে তিনি তা রামাযান মাসের অধ্যায়ে আলোচনা করবেন কেন?

(পাঁচ) এ হাদীসটি আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক উল্লেখ করার পর বলেছেন, তিনি হাদীসটি ইমাম বাইহাকীর 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' কিতাব থেকে নিয়েছেন। ইমাম বাইহাকী তার 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে মাত্র দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল এই হাদীস। তিনি তার 'শুআ'বুল ঈমান' গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কিত এই বইয়ে আলোচিত ৫ নং হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ

وقد روي في هذا الباب أحاديث مناكير، رواتها قوم مجهولون ذكرنا في كتاب الدعوات منها حديثين

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ এ বিষয়ে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার বর্ণনাকারীরা অপরিচিত। আমি তা থেকে দু'টি হাদীস 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে ফলাফল দাড়াল কি? ইমাম বাইহাকীর এ মন্তব্যে যা প্রমাণিত হলঃ

(১) শবে বরাত সম্পর্কে অনেক মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস রয়েছে।

(২) আদ-দাওআত আল-কাবীর গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দুটি মুনকার।

(৩) তাই আলোচ্য হাদীসটি হাদীসে মুনকার।

(৪) তিনি 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থটি আগে সংকলন করেছেন, তারপরে শুআবুল ঈমান সংকলন করেছেন। এ কারণে তিনি পরবর্তী কিতাবে আগের কিতাবের ভুল সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করেছেন। এটা তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার একটি বড় প্রমাণ।

(৫) মুনকার হাদীস 'আমলের জন্য গ্রহণ করা যায় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৬) যিনি হাদীসটি আমাদের কাছে পৌছিয়েছেন তিনি নিজেই যখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত দিয়েছেন তখন আমরা তা সঠিক বলে গ্রহণ করব কেন?

সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিলঃ ইসলাম ধর্মে সৌভাগ্য রজনী বলতে কিছু নেই। নিজেদের সৌভাগ্য রচনার জন্য কোন অনুষ্ঠান বা ইবাদাত-বন্দেগী ইসলামে অনুমোদিত নয়। শবে বরাতকে সৌভাগ্য রজনী বলে বিশ্বাস করা একটি বিদ'আত তথা ধর্মে বিকৃতি ঘটানোর শামিল। এ ধরনের বিশ্বাস খুব সম্ভব হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। তারা সৌভাগ্য লাভের জন্য গনেশ পূজা করে থাকে। সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে এবং সারা জীবন সালাত-সিয়াম-যাকাত ত্যাগ করে শুধুমাত্র একটি রাতে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে রাত জেগে ভাগ্য বদল করে সৌভাগ্য হাসিল করে নিবেন এমন ধারণা ইসলামে একটি হাস্যকর ব্যাপার। ধর্মে বিকৃতির কৃতিত্বে শিয়া মতাবলম্বীদের জুড়ি নেই। এ শবে বরাত প্রচলনের কৃতিত্বও তাদের। ফারসী ভাষার "শবে বরাত" নামটা থেকে এ বিষয়টা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা এ দিনটাকে ইমাম মাহদীর জন্ম দিন হিসাবে পালন করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, এ রাতে ইমাম মাহদীর জন্ম হয়েছে। এ রাতে

http://islaminonesite.wordpress.com

তারা এক বিশেষ ধরনের সালাত আদায় করে। যার নাম দিয়েছে "সালাতে জাফর"।

শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থানঃশবে বরাত উদযাপন করা ও না করার ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলিমদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ যারা কোনভাবেই শবে বরাত উদযাপন করেন না ও উদযাপন করাকে ইসলাম সম্মত মনে করেন না।

দ্বিতীয়তঃ যারা সম্মিলিতভাবে শবে বরাত উদযাপন করেন না ঠিকই, কিন্তু এ রাতে ব্যক্তিগতভাবে চুপে চুপে 'আমল করা ফাযীলাতপূর্ণ মনে করেন, দিবসে সিয়াম পালন করেন ও রাত্রি জাগরণ করেন।

তৃতীয়তঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে মাসজিদে জমায়েত হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করেন, কবর যিয়ারত করেন, মাসজিদে ওয়াজ-নাসীহাতে শরীক হন, পরের দিন সিয়াম পালন করেন, এই রাতে হায়াত-মউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন বলে বিশ্বাস করেন। সারা রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করেন। তবে আতশ-বাযি, মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা ইত্যাদিকে নাজায়েয বলে জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

চতুর্থতঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে আতশবাজি, আলোক সজ্জা ও আমোদ ফুর্তি করেন ও সময় সুযোগ মত ইবাদাত-বন্দেগীও করেন।

এ চার প্রকার লোকদের মধ্যে প্রথম প্রকারের মানুষের সংখ্যাই বেশী। আমি কিন্তু এ কথা বলতে চাচ্ছিনা যে, অধিকাংশ মুসলিম শবে বরাত পালন করেন না বলে তা করা ঠিক নয়। বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর এ বিভক্তি শবে বরাত উদযাপন বিদ'আত হওয়ার একটা স্পষ্ট আলামত। এ ক্ষেত্রে আমি বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এর কিতাব 'র্শিক ও বিদয়াত' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া যথার্থ মনে করছি। তিনি লিখেছেনঃ "আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো বিশ্বব্যাপী সম-আদর্শতা। এই সমাদর্শ ও স্বাদৃশ্যতা যেমন কাল ও সময়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তেমনি স্থানের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ হচ্ছেন রাব্বুল মাশরিকাইন ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন; পূর্ব-পশ্চিম সকল কিছুর রব ও মালিক। তিনি স্থান ও কালের সীমা ও বাঁধার উর্দ্ধে। তাই তাঁর শরীয়াত ও তাঁর দ্বীনে এক অত্যাশ্চর্য সমতা ও সমাদর্শ বিদ্যমান। তাঁর আখিরী শরীয়াত ও আখিরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে এসে যা হয়েছে তাকমীল -পূর্ণতা প্রদীপ্ত সূর্যের

http://islaminonesite.wordpress.com

মতই সকলের জন্য সমান এবং আকাশ ও মাটির মত সকলের জন্য সম উপযোগীতাপূর্ণ। প্রথম যুগে এর যে রূপ ও আকৃতি ছিল হিজরী পনের শতকেও উহার রূপ ও আকৃতি সেই একই। প্রাচ্যবাসীদের জন্য এটি যেমন ও যতটুকু, ঠিক তেমন ও ততটুকুই প্রতীচ্যের জন্য। যে সমস্ত নীতি ও নির্দেশ, ইবাদাতের যে রূপ ও আকৃতি, আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে সমস্ত সুনির্ধারিত পন্থা ও উপায় আরবদের জন্য ছিল ঠিক তদ্রূপ আছে তা ভারতবাসীর জন্যও। তাই দুনিয়ার যে কোন অংশের একজন মুসলিম অধিবাসী অপর কোন অংশে যদি চলে যায় তাহলে ইসলামী ফরয আদায় এবং ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে তার কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তার জন্য কোন স্থানীয় গাইডের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি যদি আলিম হন, শরীয়ত সম্পর্কে বিজ্ঞ হন তাহলে কেবল মুক্তাদীই নয় অধিকন্তু যে কোন স্থানে তিনি ইমামও হতে পারেন।

বিদ‘আতের অবস্থা এর বিপরীত। এতে সমদৃশ্যতা ও একত্বতা নেই। স্থান ও কালের প্রভাব এতে পরিস্ফুট থাকে। গোটা মুসলিম বিশ্বে এর একটিমাত্র রূপে প্রচলনও হয়ে ওঠে না।”

সকল ধরনের বিদ‘আতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। শবে বরাত এমনি একটা বিষয় যা আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা মহা ধুমধামে উদযাপন করছি, কিন্তু অন্য এলাকার মুসলিমদের কাছে এ সম্পর্কে কোন খবর নেই। কি আশ্চর্য! এমন এক মহা-নিয়ামাত যা মক্কা-মদীনার লোকেরা পেলনা, অন্যান্য আরবরা পেলনা, আফ্রিকানরা পেলনা, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়রা পেলনা, ইউরোপ-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকেরা পেলনা; অথচ ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যের মহান রাত পেয়ে গেলাম আমরা উপ-মহাদেশের কিছু লোকেরা ও শিয়া মতাবলম্বীরা!

এ বিষয়টি যদি বিভ্রান্তিকর না হত তাহলে সকল মুসলিমের পাওয়ার কথা ছিল। হাদীসে এসেছেঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. (رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ١٨٤٨)

অর্থঃ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে কোন গোমরাহী বা বিভ্রান্তিতে একমত হতে দিবেন না। (তিরমিযী)

অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجمع على ضلالة.
(صحيح الجامع) ١٧٨٦ رقم ١٧٨٦)

অর্থঃ সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলা আমার উম্মতকে কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (সহীহ জামেয়)। এ হাদীসের অর্থ হল আমার উম্মত যদি কোন বিষয়ে একমত হয় তাহলে সে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হতে পারে না। আর আমার উম্মতের কোন বিষয়ে একমত না হওয়ার বিষয়টি বিভ্রান্ত হওয়ার একটা আলামত হতে পারে।

শবে বরাত এমনি একটি ‘আমল যে উম্মতে মুসলিমাহ এ বিষয়ে কখনো একমত হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। আবার যারা উদযাপন করেন তাদের মধ্যেও দেখা যায় ‘আমল ও বিশ্বাসের বিভিন্নতা।

শবে বরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব উলামায়ে কিরামের ইসলাম ধর্মে যতগুলো বিদ‘আত চালু হয়েছে তা কিন্তু সাধারণ মানুষ বা কাফির মুশরিকদের মাধ্যমে প্রসার ঘটেনি। উহার প্রসারের জন্য দায়ী যেমন এক শ্রেণীর

উলামা, তেমনি উলামায়ে কিরামই যুগে যুগে বিদ‘আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, জেল-যুল্ম বরদাশত করেছেন। তাই বিদ‘আত যে নামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন উহার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে আলেমদেরকেই। তারা যদি এটা না করে কারো অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ করেন, বিভ্রান্তি ছড়ান বা কোন বিদ‘আতী কাজ-কর্ম প্রসারে ভূমিকা রাখেন, তাহলে এ জন্য তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। যে দিন বলা হবেঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.(القصص :৬৫)

অর্থঃ আর সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলদের আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস, ৬৫)

সেদিন তো এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক পীরের মত অনুযায়ী বা অমুক ইমামের মত অনুযায়ী ‘আমল করেছিলে কিনা। যারা সহীহ সুন্নাহ মত ‘আমল করবে তারাই সেদিন সফলকাম হবে।

শবে বরাত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির নিরসনঃ ১৫ শাবানে দিনের সিয়াম ও রাতের ইবাদাত-বন্দেগী, কুরআন

তেলাওয়াত, নফল সালাত, কান্নাকাটি, দু'আ-মুনাজাত, কবর যিয়ারাত, দান-সাদকাহ, ওয়াজ-নাসীহাত প্রভৃতি নেক 'আমল গুরুত্বসহকারে পালন করাকে যখন কুরআন ও হাদীস সম্মত নয় বলে আলোচনা করা হয় তখন সাধারণ ধর্ম-প্রাণ ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসে যে, জনাব! আপনি শবে বরাতে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীকে বিদ'আত বা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত নয় বলেছেন, কিন্তু রোযা রাখা সওয়াবের কাজ ও রুটি তৈরী করে গরীব দুঃখীকে দান করা ভাল কাজ নয় কি? আমরা কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দোষের কি?

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দু'আ-মুনাজাত, সালাত, সিয়াম, দান-ছাদাকাহ, কুরআন তিলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ হল নেক আমল। এতে কারও দ্বি-মত নেই।

আমরা কখনো এগুলিকে বিদ'আত বলি না। যা বিদ'আত বলি এবং যে সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই তা হল এ রাতকে শবে বরাত বা সৌভাগ্য রজনী অথবা মুক্তি রজনী মনে করে বিভিন্ন প্রকার আমল ও ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা। এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী।

এটাই ধর্মে বাড়াবাড়ি। যা ধর্মে নেই তা উদযাপন করা ও প্রচলন করার নাম বিদ'আত।

সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের তেইশ বছরের জীবনে কখনো তার সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মক্কায় মাসজিদুল হারামে অথবা মদীনায় মাসজিদে নবুবীতে কিংবা অন্য কোন মাসজিদে একত্র হয়ে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীসমূহ করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তথা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কেহ জানতো না শবে বরাত কি এবং এতে কি করতে হয়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আমল প্রত্যক্ষ করেছেন।

আমাদের চেয়ে উত্তম রূপে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। তারা তাতে শবে বরাত সম্পর্কে কোন দিক-নির্দেশনা পেলেন না। তারা তাদের জীবন কাটালেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, অথচ জীবনের একটি বারও তাঁর কাছ থেকে শবে বরাত বা মুক্তির রজনীর ছবক পেলেন না? যা পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যাননি, যা কুরআনে নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা'লীমে নেই, সাহাবীগণের

http://islaminonesite.wordpress.com

‘আমলে নেই, তাদের সোনালী যুগের বহু বছর পরে প্রচলন করা শবে বরাতকে আমরা বিদ‘আত বলতে চাই। আমরা বলতে চাই, এটা একটা মনগড়া পর্ব। আমরা মানুষকে বুঝাতে চাই, এই সব প্রচলিত ও বানোয়াট মুক্তির রজনী উদযাপন থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতএব, আমরা উম্মতকে কুরআন ও সুন্নাহমুখী করতে এবং সেই অনুযায়ী ‘আমল করাতে অভ্যস্ত করতে চাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সন্দেহজনক নফল ‘আমল থেকে দূরে থাকা উত্তমঃ যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, শবে বরাত শর’য়ীভাবে প্রমাণিত, তাহলে উহার মর্যাদা কতটুকু হবে? বেশী হলে মুস্তাহাব। কেহ যদি সারা জীবন মুস্তাহাব শবে বরাতটা বর্জন করে তাহলে তার কি ক্ষতি হবে?

কিন্তু যদি এটা বিদ‘আত হয়, আর যারা এর দিকে মানুষকে আহ্বান করল, উৎসাহিত করল, মানুষকে বিভ্রান্ত হতে প্ররোচিত করল, আকীদা-বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটালো, এর প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখল তাহলে তাদের পরিণাম কি হবে?

http://islaminonesite.wordpress.com

একটু ভেবে দেখবেন কি? (তথ্যসূত্রঃ শবে বরাত – লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ)[88]।

ফিকাহর মূলনীতিতে একটি কথা আছে, "নতীজা আরজালের তাবে হয়" অন্যভাবে বলা যায়ঃ

دفع المضر أقدم من جلب المنافع.

অর্থাৎ একটা বিষয় লাভ ও ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকলে ক্ষতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে এবং বিবেচনায় আনা হবে। হাদীসে এসেছেঃ

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين
وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من
الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن
وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله
محارمه. (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ আবূ আব্দুল্লাহ নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিঃ নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট করে বলা

[88] শবে বরাত – লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ

হয়েছে ও হারাম পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দুটোর মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেক মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল সে নিজের দ্বীন ও ইয্যাত আবরুকে বাঁচাল। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয় সে প্রকারান্তরে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। যেমন কোন রাখাল যদি তার গবাদিপশু নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে নিয়ে যায় তাহলে তার অচিরেই নিষিদ্ধ চারণভূমিতে ঢুকে যাওয়ার আশংকা থাকে। তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রত্যেক রাজা-বাদশার সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমুহ। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত আলোচনার শেষ কথা হল, শবে বরাত একটি বিদ'আতী পর্ব। অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলাম যেঃ

(১) এ রাতকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের 'আমল করার সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস নেই।

(২) এ রাত সম্পর্কে যা কিছু আকীদাহ বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা পোষণ করা জায়েয নয়।

(৩) এ রাতে ইবাদাত বন্দেগী করলে সৌভাগ্য খুলে যায় এমন ধারণা একটি বাতিল আকীদাহ।

(৪) এ রাতে হায়াত, মউত ও রিযিক বন্টনের বিষয় লেখা হয় বলে যে বিশ্বাস তা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী। তাই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(৫) এ রাতকে কেন্দ্র করে যেমন সম্মিলিতভাবে ইবাদাত বন্দেগী করা, রাত্রি জাগরণ করা ঠিক নয় তেমনি ব্যক্তিগত ইবাদাত বন্দেগী করাও ঠিক হবে না। তবে নিয়ম বা রুটিন মাফিক ইবাদাত বন্দেগীর কথা আলাদা। যেমন কেহ সপ্তাহের দু দিন রাত্রি জাগরণ করে থাকে। ঘটনাচক্রে এ রাত সেদিনের মধ্যে পড়লে অসুবিধা নেই। কিন্তু এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে অধিক সওয়াব হবে এমন ধারণায় ব্যক্তিগতভাবে বা চুপিসারে কিছু করাও ঠিক হবে না।

(৬) ১৫ শাবানের রাতই দ'ুআ কবূলের রাত নয়। বরং প্রতি রাতের শেষ অংশ দু'আ কবূলের সময়।

(৭) শুধু ১৫ শাবানের রাতেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন না, বরং প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আকাশে অবতরণ করে বান্দাদেরকে

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান।

(৮) শবে বরাতের 'আমল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো কোনটা জাল, আবার কোনটা যয়ীফ বা দুর্বল সূত্রের।

অতএব এ রাত উদযাপন করা থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করতে হবে। যে কোন ধরনের বিদ'আতী কাজ থেকে মানুষকে সাধ্যমত বিরত রাখা 'আল-আমর বিল-মারূফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারেন মুহতারাম উলামায়ে কিরাম, শ্রদ্ধেয় আইয়েম্মায়ে মাসাজিদ, দায়ী'গণ ও ইসলামী আন্দোলনে শরীক ব্যক্তিবর্গ।

(৩) শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী (عيد ميلاد النبى) বা মীলাদ মাহ্ফিল এবং কিয়াম – নব আবিষ্কৃত বিদ'আতঃ

ঈদে মিলাদুন্নবী কিংবা মিলাদ মাহফিল পালন করা বিদআত। তেমনিভাবে জন্মদিন পালন করা, জন্মঅস্টমী (হিন্দু), বড়দিন (খ্রিস্টান), মিলাদুন্নবী একই কথা একই ও কাজ। সুরা আল ইমরান (৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – হে মানুষ ,তোমরা যারা (আল্লাহর উপর)ইমান এনেছো,তোমরা যদি অমুসলিমদের অনুসরন করতে শুরু

করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তি (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা নিদারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। নবী (ﷺ) এর (মৃত্যু) ইন্তেকালের পর কোন সাহাবী (রাঃ) নবী (ﷺ) এর মিলাদুন্নবী অনুস্ঠান করেনি।তাহলে আমরা করছি কেন? তাহলে সাহাবীরা কি ভুল করে গেছে? এ থেকে মানুষ শিখেছে নিজের,ছেলে মেয়ের জন্মদিন পালন।আরো লোক আছে তাদের জন্মদিন কেন পালন করছেন না? (সাহাবীরা,বাকি নবী-রাসুলরা কি দোষ করেছেন তাদের নাম তো আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। নবী (ﷺ) ইদে মিলাদুন্নবীর দিন কয় রাকাত নামায পরেছেন? ঈদের দিনতো মানুষ ২ রাকাত নামায পড়ে নাকি? ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা মানে টাকার অপচয় এবং দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা আর দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা মানেই বিদ'আত। তাই এই বিষয় কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কেন মিলাদুন্নবী পালন করেন? উত্তরে সে বলে আমরা মিলাদুন্নবী করি কারন আমরা নবী (সাঃ) কে ভালবাসি। আপনি যে টাকা মিলাদুন্নবীর দিন খরচ করছেন এইটা কি ঠিক? আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পথে খরচ করতে (দান করেন?)? ।যারা মিলাদুন্নবী করে তাদের চিন্তা দ্বীন পুর্নাঙ্গ না তারা দ্বীন কে পুর্নাঙ্গ করার অযথা চেষ্টা করছে।কিন্তু আল্লাহ বলছেন –

“আমি তোমাদের জন্য দ্বীন কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” (সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং - ৩)। অথচ আমরা মুসলিমরা ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যেইটা করা উচিৎ সেইটাই আমরা করি না। অথচ আমাদের ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে নবী (সাঃ) প্রতি অতিরিক্ত সলাত (দুরুদ) পাঠ করা উচিত যা তিনি আদেশ করে গেছেন। বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এর জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, “এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেননি অথচ এ কাজ জায়িয থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশী করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম-কে বেশী সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশী আগ্রহী।”

নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ঈদে মিলাদুন্নবী'র শাব্দিক বিশ্লেষনঃ 'ঈদ' অর্থ হচ্ছে খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করা। আর 'মীলাদ' ও 'নবী' দুটি শব্দ একত্রে মিলিয়ে 'মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' বলা হয়। 'মীলাদ'-এর তিনটি শব্দ রয়েছে- ميلاد মীলাদ, مولد মাওলিদ ও مولود মাওলূদ। ميلاد 'মীলাদ' অর্থ জন্মের সময়, مولد 'মাওলিদ' অর্থ জন্মের স্থান, مولود 'মাওলূদ' অর্থ সদ্যপ্রসূত সন্তান। আর النبى 'নবী' শব্দ দ্বারা নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - উনাকে বুঝানো হয়েছে। অর্র্থাৎ আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে ميلاد النبى 'মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' বলতে নূরে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- উনার বিলাদত শরীফকে বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং عيد ميلاد النبى 'ঈদু মীলাদিন নবী' ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' বলতে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে আর পারিভাষিক বা ব্যবহারিক অর্থে عيد ميلاد النبى 'ঈদে মীলাদুন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' বলতে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - উনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে উনার ছানা-ছিফত বর্ণনা করা, উনার প্রতি ছলাত-

http://islaminonesite.wordpress.com

সালাম পাঠ করা, উনার পুতঃপবিত্র জীবনী মুবারকের সামগ্রিক বিষয়ের আলোচনা করাকে বুঝানো হয়। এক কথায় ‘ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ’ অর্থ নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পবিত্র ‘বিলাদত শরীফ’ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করা। অর্থাৎ খুশী প্রকাশ করে মীলাদ শরীফ মাহফিলের ব্যবস্থা করা, উনার শান-মান, মর্যাদা-মর্তবা আলোচনা করা, সলাত-সালাম পাঠ করা।

বিঃ দ্রঃ ঈদ, মীলাদ ও আননাবী তিনটি শব্দই আরবি। যেগুলো ফার্সী ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দ তিনটি একসাথে আরবীতে বললে এভাবে বলতে হবে: “ঈদু মীলাদিন নাবী” আর ফার্সীতে বললে হবে: “ঈদে মীলাদিন নাবী”| আর এ শব্দগুলো আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে “ঈদে মীলাদুন নবী” রূপে।

সাধারণত ১২ রবীউল আওয়াল তারিখে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন উপলক্ষে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তবে যে কোন ব্যক্তির জন্মদিন, নতুন ব্যবসায়ের সুত্রপাত, গৃহ নির্মাণ সমাপ্তি, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বছরের যে কোন সময় মীলাদ মাহফিল

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৬নং আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে*। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

অথচ আমাদের সমাজে বর্তমানে যেসব জঘন্য বিদ'আত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তন্মধ্যে অন্যতম হলো- রাবী'উল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর জন্মদিন পালন বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপন। এই বিদ'আত কর্মটি বিভিন্নভাবে পালিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ (মীলাদুন্নাবী) উপলক্ষে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর জন্মকাহিনী পড়ে থাকেন কিংবা ওয়া'য-নাসীহাত এবং বিভিন্ন ধরনের ক্বাসীদাহ, গযল, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করে থাকেন। কেউ কেউ এ উপলক্ষে সমবেত লোকদের মাঝে সেমাই, মিষ্টি ও হালুয়া বিতরণ করে থাকেন। এসব মীলাদ মাহ্ফিল কেউ কেউ মাসজিদে আবার কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়িতে আয়োজন করে থাকেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার অনেকে এমনও আছেন যারা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং তাতে তারা নানা ধরনের অবৈধ ও হারাম কাজ যেমন- নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, ঢোল-তবলা, নাচ-গান, রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাকে আহ্বান করা, তাঁর সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শির্‌কী ও কুফরী কাজ-কর্ম করে থাকে। এই মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান তা যেভাবেই পালন বা উদযাপন করা হোক না কেন কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, ইসলামী শারী'য়াতে সর্বাবস্থায় এটি বিদ'আত ও নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ। এটি উত্তম যুগের অনেক পরে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি কাজ। অথচ আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থায় রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা

মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখ, এটাই কল্যানকর এবং শ্রেষ্ঠতর সমাধান।” [সূরা নিসাঃ ৫৯][89] আর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়ায় তাঁর সুন্নাহ শরীয়তের দলিল হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয়। আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) আরও বলেছেনঃ

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে চিরদিন অবস্থান করবে।” [সূরা জীনঃ ২৩][90]। রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য শাস্তির বিধান সাব্যস্ত থাকায় প্রমাণিত হলো যে, সুন্নাহ অবশ্যই আল-কুরআনের মতই হুজ্জত (দলিল)।রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ বলতে বুঝায় দালালাতুল কুরআন (কুরআনের নস) মুতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কাজ করেছেন ও তিনি নিজে যা সুন্নত করেছেন সে সব কাজ করা।অতএব, হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর প্রতি আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[89] সূরা আন-নিসা, আয়াত নং - ৫৯

[90] সূরা জীন, আয়াত নং - ২৩

http://islaminonesite.wordpress.com

ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ আবিষ্কারের কাহিনীঃ চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাত্বিমী গোত্রের তথাকথিত দাবিদার [যারা নিজেদেরকে ফাত্বিমাহ (رضي الله عنه) এর বংশধর বলে মিথ্যা দাবি করে] 'উবায়দী গোত্রের শী'আ শাসকগণ এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল মু'য়িয লি দ্বীনিল্লাহ নামক শাসক মিশরে এই বিদ'আত প্রবর্তন করে। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ৭ম হিজরী শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক যথাক্রমে ইবনু কাসীর ও ইবনু খালক্কানের মতে ইরদীল শহরের শাসক মুযাফ্ফার আবূ সা'ঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী পুনরায় নব উদ্যমে এই বিদ'আতটি চালু করে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান সালাহাউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২ – ৫৮৯ হিজরী) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গর্ভনর মুযাফ্ফার আবূ সা'ঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬ - ৬৩০ হিজরী) সর্বপ্রথম কারও মতে ৬০৪ হিজরী ও কারো হিসাব মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের সূচনা ঘটে। [তথ্যসূত্রঃ মহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (মউ, ইউ পি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা নং – ৫, আবুবকর আল-জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি), পৃষ্ঠা নং – ৩১।][91] তাঁর এই মীলাদ আবিষ্কারের

[91] মহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (মউ, ইউ পি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা নং – ৫,

http://islaminonesite.wordpress.com

পিছনের কাহিনী আর কিছুই নয় বরং মিথ্যা নাবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারনের মন জয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যেমন তিনি প্রতি বছর মিলাদুন্নবী উৎসের নামে প্রাসাদের নিকট তৈরী অন্যূন ২০টি খানকাহে গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনও মহররম বা সফর মাস থেকেও এইসব গান-বাজনার মহড়া শুরু হত। এমনকি কবি, গায়কদের দিয়ে জোর করিয়ে এইসব বিদ’আতী আয়োজনের অনুষ্ঠান করত এবং ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজনের মাধ্যমে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হত। (তথ্যসূত্রঃ তারিখু ইবনে খাল্লিকান, (বৈরুত ছাপা, তাবি), ৪/১১৩-২১ পৃষ্ঠা।)[92] এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেনঃ গর্ভনর নিজে নাচে অংশ নিতেন। (তথ্যসূত্রঃ আব্দুস সাত্তার দেহলোভী, মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং – ২০,৩৫।)[93] অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থ ব্যয় করে রাবী‘উল আওয়াল মাসে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে অত্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। আর এভাবেই এই জঘন্য বিদ‘আতটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

আবুবকর আল- জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা , তাবি), পৃষ্ঠা নং – ৩১।

[92] তারিখু ইবনে খাল্লিকান, (বৈরুত ছাপা, তাবি), ৪/১১৩-২১ পৃষ্ঠা।

[93] আব্দুস সাত্তার দেহলোভী, মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং – ২০,৩৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব বুঝা গেল, প্রচলিত মিলাদের প্রবর্তক বাদশা মুজাফফর ইসলামী বিধি বিধানের গুরুত্ব দিতেন না। গান বাজনায় লিপ্ত হতেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে মিলাদের আয়োজন করতেন। আলেমদেরকে প্রলোভন দিয়ে ইচ্ছা মত ব্যাবহার করতেন।

অন্য দিকে যে আলেম প্রচলিত মিলাদ প্রবর্তনে সাহায্য করেন তার নাম মাজদুদ্দিন আবুল খাত্তাব উমার বিন হাসান বিন আলী বিন জমায়েল। তিনি নিজেকে সাহাবী দাহেয়াতুল কালবি এর বংশধর বলে দাবি করেন। অথচ তা ছিল মিথ্যা দাবি। কারণ দাহেয়াতুল কালবি (রা.) কোনো উত্তরসুরী ছিল না। তাছাড়া তার বন্সধারায় মধ্যস্তন পূর্বপুরুষরা ধংসের মধ্যে নিপাপিত হয়েছিল। তারপরেও তার বর্ণিত বংশ ধারায় অনেক পুরুষের উল্লেখ নাই। (মিজানুল ইতিদাল (১/১৮৬) এই সরকারি দরবারী আলেম একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মিলাদের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়। ৬০৪ হিজরীতে শাসক মুজাফ্ফারকে পুস্তকটি উপহার দেন। এতে তিনি খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দিনার বখশিশ দেন। আর সে বছর হতেই তিনি মিলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। (টিকা সিয়ারু আলা মিন্নুবালা ১৫/২৭৪)[94]।

[94] সিয়ারু আলা মিন্নুবালা ১৫/২৭৪

মিলাদ প্রথা আবিস্কারের পরে সে সময়ের মানুষ বছরে একটি দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) তা পালন করত এবং তা কয়েকদিন ধরে চলত। পরবর্তিতে ভক্তরা এটকে সওয়াবের কাজ মনে করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে পালন করতে শুরু করে। আগে বড় ধরনের মাহফিলের আয়জন করা হত। বর্তমান মনগড়া কিছু দুরুদ ও গজল গেয়ে শেষ করা হয়।

বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের উক্তিঃ

এই বাদশার চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী উল্লেখ করেনঃ

كانت ملكا مسرفا يآمر علماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا لمذهب غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطاءفة من الفضلاء ويحتفل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم

فى الربيع الاول و هو اول من الملوك هذا العمل . القول المعتمد فى عمل المل المولد.

অর্থঃ সে ছিল একজন অপচয়ী বাদশাহ্। সে তার সময়কার উলামায়ে কেরামকে অন্যের মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে

http://islaminonesite.wordpress.com

নিজ নিজ ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। আর এতে দুনিয়া পুজারী উলামা ও ফুযালার একটি দল তার দিকে ঝুকে পড়ে। সে রবিউল আওয়ল মাসে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করত। বাদশাহদের মাঝে এ-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদ'আতের (মীলাদ-মাহফিলের) প্রচলন করেন।

এ অপচয়ী বাদশাহ্ প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখার জন্য এই বিদ'আত উৎসবের আয়োজন করত, আর তাতে জাতির বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অকাতরে অপচয় করত । এ অপচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন,

كان ينفق كل سنة على مولد النبى صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث مآة الف

অর্থাৎ সে প্রতি সৎসর মীলাদ-মাহফিলে প্রায় তিন লাখ (দিরহাম/দীনার) ব্যয় করত। (দুয়ালুল ইসলাম ২/১০৩)[95]

দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব যিনি মীলাদ-মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ সম্বলিত কিতাব রচনা করে

[95] দুয়ালুল ইসলাম ২/১০৩

http://islaminonesite.wordpress.com

বাদশাহর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কড়ি হাতিয়ে নিয়েছেন, তার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন,

كثير الواقعة فى الائمة وفى السلف من العلماء خبيث اللسان احمق شديد المكر قليل النظر

فى امور الدين متهاونا

অর্থাৎ, সে আইম্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজ মূলক কথাবার্তা বলত। সে ছিল দুষ্টভাষী, আহমক ও চরম ধোকাবাজ। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন। (লিসানুল মীযান)[96]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আরো বর্ণনা করেনঃ

قال ابن النحار رايت الناس محتمعين على كذبه و ضعفه

অর্থাৎ. ইবনে নাজ্জার (রহঃ) বলেন, আমি মানুষদেরকে তার (উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহ্ইয়া আবুল খাত্তাব-এর) মিথ্যা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ বা একমত পেয়েছি। (লিসানুল মীযান)[97]

---

[96] লিসানুল মীযান

[97] ঐ

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল প্রচলনকারীদের একজন হলেন প্রতারক, ধূর্তবাজ বাদশাহ, আরেকজন হলেন স্বার্থান্বেষী দুনিয়ালোভী মৌলভী। আর তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন ঐ সকল পীর, সূফী-যারা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছেননি। এ তিন দলের সমন্বিত প্রয়াস ও অপপ্রচারে সাধারণ জনগণ হয়েছেন বিভ্রান্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন,

و هل افسد الدين الا الملوك + و احبار سوء ورهبانها

অর্থাৎ, রাজা বাদশাহ অসৎ পন্ডিত ও সাধুরাই দর্মকে নষ্ট করে থাকে।

প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি

তাই সর্বযোগের হক পন্থীরা এবং সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কঠোরভাবে এর (মীলাদ-মাহফিলের) বিরোধিতা করেছেন এবং বাতিল পন্থীদের সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তি খন্ডন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) (তার ফাতাওয়ার ১ম খন্ডের ৩১২নং পৃষ্ঠায়)[98], ইমাম নাসিরুদ্দিন শাফেঈرشاد الاخيار গ্রন্থে, মুজাদ্দেদে আলফেসানী

[98] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ার ১ম খন্ডের ৩১২ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহীত।

http://islaminonesite.wordpress.com

(রহঃ) مكتوبات ৫ম খন্ডের ২২ নং পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আমীরুল হাজ্ব মালেকী (রহঃ) সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন,

ومن جملة ما احدثوا من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر ما يفعلون فى الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات الى ان قال وهذه المفاسد مترتبة على فعل المولد اذا علم بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا اليه الا خوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط لان ذلك زيادة فى الدين وليس من عمل السلف الماضين و اتباع السلف اولى

আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরীবী তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন,

ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الائمة –

كذا فى الشرعة الالهية -

অর্থাৎ, মীলাদকর্ম বিদ'আত। রাসূল (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ কেউ এ ব্যাপারে বলেননি এবং তা করেননি। আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মিসরী মালেকী (রহঃ) লিখেন-

قد اتفق علماء المذاهب الاربعة بذم هذا العمل – راه سنة از القول المعتقد فى عمل المولد

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ মাযহাব চতুষ্ঠয়ের উলামায়ে কেরাম এই কাজ (মীলাদ) নিন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

প্রচলিত মীলাদ পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খন্ডন

পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খাইরুল কুরুনে এই মীলাদ মাহফিলের সূচনা হয়নি। বরং ৬ষ্ঠ শতাব্দির পর এর সূচনা হয়েছে। সূচনা কারীদদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে যে, তৎকালীন এক বদকার বাদশাহ এর পৃষ্টপোষকতা করেছেন। আর গৃহিত এই নীতির পরে সর্ব সাধারণের মাঝে এর ব্যপক প্রভাব পড়েছে যা এই বিষয়ে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন। এত কিছুর পর মীলাদের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ না দিতে পেরে প্রসিদ্ধ বিদ'আতী মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব আরো অনেকে নিজেদের আত্ম প্রশান্তি ও অনুসারীদের সান্তনা প্রদানের জন্য তিহাত্তরজন মনীষীর তালিকা পেশ করেছেন, যারা মীলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন। কিন্তু এ তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের নাম নেই। যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশই সূফীয়ায়ে কেরাম, মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এর কথা (হালাল হারামের ব্যাপারে

সূফীদের কথা সনদ নয়) অনুযায়ী যাদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে কয়েকজন দার্শনিক আলেম রয়েছেন তারা ভ্রান্ত কিয়াসের শিকার হয়েছেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব মীলাদেরস্বপক্ষে একটি দলীল পেশ করেছেন যে, হারামাইন শরীফাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং যে রাষ্টেই যাবে সেখানেই মুসলমানদের মাঝে এ কাজটি পাবে। বুযুর্গানে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম এর বড় বড় ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সবযুগেই সবস্থানেই উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান মুস্তাহাব জেনে আসছেন-"মুস্তাহাব হওয়া-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান কাজটিকে ভাল জানে।"

যুক্তি খন্ডনঃ

এই দলীলের উত্তর হল- তখন এ হারামাইন শরীফাইনও ছিল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তাঁরাও ছিলেন। তাঁরা কি মীলাদ মাহফিলের বরকত ও ফযীলত সম্পর্তে অবগত ছিলেন না? তবে কেন তাঁরা করেন নি? সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এমন একটি উত্তম কাজ পরিত্যাগ করেছেন তা কি মেনে নেয়া যায়?

http://islaminonesite.wordpress.com

অথচ খুলাফায়ে রাশিদীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ- তোমাদের উপর আবশ্যকীয় হলো আমার সুন্নাত এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদীনের ছুন্নাত অবলম্বন করা, তোমরা একে মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো (শক্ত করে আঁকড়ে ধরো) এবং তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদী হতে সাবধান থেকো! কেননা প্রতিটি নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই হলো বিদ‘আত আর প্রতিটি বিদ‘আতই হলো পথভ্রষ্টতা। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব আলবানী, হা/৯৭।)।

তাছড়া শরী‘আতের ভাষ্যসমূহ (نصوص) এর মাঝে হারামাইন শরীফাইনের অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। তবে হারামাইন শরীফাইন তথা সেখানকার আমল শরী‘আতের দলীল নয়। সেখানে শরী‘আত পরিপন্থী কাজের প্রচলনও হয়ে পড়তে পারে।

শরী‘আতের দলীল মাত্র দুটি যথা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস। তাই হারামাইন শরীফাইনে যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে ভাল نور على نور – । অন্যথায় কক্ষনো তা দলীল হতে পারে না। হারামাইনেও মাঝে মধ্যে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এক সময়কার হারামাইন শরীফাইনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেনঃ

فی الحرمین الشریفین من شیوع الظلم وکثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنکرات وفشو البدع والسیئات واکل الحرام والشبهات

অর্থাৎ, হারামাইন শরীফাইনের মাঝে অন্যায় অত্যাচার ব্যাপক লাভ করেছে, অজ্ঞতা বেড়ে গেছে, ইলম কমে গেছে, অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, বিদ‘আত প্রসার লাভ করেছে, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ জিনিস খাওয়া বেড়ে গেছে। (মেরকাত ৫ম খন্ড ৬১৪ নং পৃষ্ঠা)[99]

অতএব হারামাইন শরীফাইন দলীল হতে পারে না। আর মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব বলেছেন, মুস্তাহাব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান সেটাকে ভাল জানে। অথচ মুস্তাহাব তো অনেক - উঁচু জিনিস বরং (মোবাহ

[99] মেরকাত ৫ম খন্ড ৬১৪ নং পৃষ্ঠা

http://islaminonesite.wordpress.com

হওয়াটা) ও শরী‘আতের একটি হুকুম যা নবী কারীম (সাঃ) এর কথা বা কাজ ছাড়া প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন,

الاستحباب حكم شرعى لا بدله من دليل

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হওয়া শরী‘আতের একটি হুকুম। তাই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে।

সারকথা - উপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল বিদ‘আত এবং দ্বীন-বহির্ভুত বিষয়।

মীলাদে কিয়াম করা প্রসংঙ্গ

কিয়াম কাকে বলে

“কিয়াম” শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মুআশারা তথা সমাজ সামাজিকতার পরিভাষায় “কিয়াম” বলতে বোঝায় কারও আগমনে দাঁড়ানো। আর মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত কিয়াম দ্বারা বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের কাসীদা পাঠ করার পর রাসূল (সাঃ) মজলিসে হাজির হয়ে গেছেন ধারণায় “ইয়া নবী ...” বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরুদ পাঠ করা।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিয়াম প্রচলনের ইতিহাসঃ প্রচলিত মিলাদের সাথে আর একটি প্রথা সংযোজিত হয়েছে। তা হল রাসুল (সাঃ) এর সম্মানাথে দাড়ান। এটি মৌলিক বিদ'আতের অন্তভুক্ত। সম্পুন অপ্রাসাংগিক একটি বিষয় মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটি মিলাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। ৭৫১ হিজরির কথা। খাজা তকিউদ্দিন ছিলেন একজন ভাব কবি ও মাজযুব (ভাবাবেগে উদ্দেলিত) ব্যাক্তি।

মহানাবী (সাঃ) এর নামে তিনি বিভিন্ন কাসিদা রচনা করেন। বরাবরের ন্যায় একদিন তিনি কাসিদা পাঠ করছিলেন। বসা থেকে ভাবাবেগে হঠাত তিনি দাড়িয়ে কাসিদা পাঠ করতে থাকলেন। ভক্তরাও তার দেখা দেখি দাড়িয়ে গেল। বাস, ঘটনা এখানেই শেষ। তিনি আর কখনো এমনটি করেননি। এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, খাজা তকিউদ্দিন কবিতা পাঠ করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটি কোন মিলাদের অনুষ্ঠান ছিল না। তিনি অনিচ্ছাকৃত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মিলাদের জন্মের একশত বছর পরে বিদআতপন্থীরা এটিকে মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফলে কিয়াম বিশিষ্ট মিলাদ বিদআত হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত আমাদের দেশে এমন অনেক বিদআত রয়েছে জা বুজুগদের বিশেষ মুহুতের আমল থেকে সৃষ্ট।

অতএব, সংশ্লিষ্ট বুজুর্গ কখনো তার ভক্তদের এসব করার নিদেশ দেননি, অনুসারীরা অজ্ঞতাবশত এসব কাজ চালু করেছে।

সমাজ-সামাজিকতায় কিয়ামের হুকুম

কোন বুযুর্গ তথা সম্মানী ব্যক্তি যখন স্বশরীরে আগমন করেন, তখন কোন কোন মুহূর্তে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছাড়া ক্বেয়াম করা (আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া) বৈধ । এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) قوموا الى سيدكم (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এ ভাবে যে, হযরত সাআদ ইবনে মু'আয (রাঃ) আঘাত প্রাপ্ত ছিলেন। নবী কারীম (সাঃ) তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য মজলিস থেকে উঠেছিলেন। এটা কোন সম্মান প্রদর্শনের

নিমিত্তে দাঁড়ানো নয়। এ ব্যপারে মুসনাদে আহমদে বিবরণ নিম্ন রূপঃ

قوموا الى سيدكم فانزاره من الحمار– অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামাও। এজন্যই الى سيدكم "তোমাদের নেতার কাছে" কথাটা বলেছে- لسيدكم "নেতার জন্য" কথাটা বলেননি। (মুসনাদে আহমদ)

যাহোক উপরোক্ত হাদীস অকাট্য অর্থ বোধক না হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল এবং নবী কারীম (সাঃ) কোন আমলটিকে পছন্দ করতেন, তা দেখা দরকার এবং সেটাই হবে আমাদের আমল। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে যানা যায় হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিমোক্ত হাদীস দ্বারা-

عن انس قال – لم يكن شخص احب اليهم من رسول لله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رآوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك – رواه الترمذى فى اباب الاستيذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – باب ماجاء فى ركاهية قيام الرجل للرجل وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه احمد حديث رقم ١٢٢٨٥ واسناده صحيح كذا فى هامشه

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী কারীম (সাঃ) এর জাত মোবারকের চেয়ে বড় সম্মানের ও প্রিয় এ দুনিয়তে আর কোন কিছুই ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাঁরা নবী কারীম (সাঃ) কে দেখলে কিয়াম করতেন না। যেহেতু তারা জানতেন নাবী কারীম (সাঃ) এ কাজটিকে (তাঁর সম্মানে দাড়িয়ে যাওয়া কিয়াম করাকে) অপছন্দ করেন। (তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ)[100]

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) নিজের জন্য কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম নাবী কারীম (সাঃ) এর প্রতি চরম ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা সত্বেও নবী কারীম (সাঃ) যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তাঁরা দাঁড়াতেন না। কেননা, নাবী কারীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর জন্য কিয়াম করা হত না এবং তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কিয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে পছন্দ করতেন না। তদুপরি মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে সেখানে রাসূল (সাঃ) এর আগমন ঘটে এটা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারাও প্রমাণিত নয় বরং রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি সেখানে হাজির হন না

[100] তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ

http://islaminonesite.wordpress.com

বরং নির্ধারিত ফেরেশতারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে সে দুরূদ পৌঁছে দেন - এ কথা স্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نا ءيا ابلغته رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم واجلاله وتوقيره - حديث رقم ١٥٨٣ وللحديث شواهد ساقها السخارى فى القول البديع

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (শুআবুল ঈমান)। অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن عيدالله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملئكته سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام رواه الدرمى فى كتاب الرقاق - باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . حديث رقم .٢٧٧٤

ورواه النسائى فى كتاب واسناده صحيح كذا فى هامشه الافتتاح - باب التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن حبان صحيحه .حديث رقم ٩٠٢. واللفظ للدارمى

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতারা রয়েছেন, যারা পৃতিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (নাসায়ী, দারিমী ও ইবনে হিব্বান)

কিয়াম সম্বন্ধে বিদ 'আতীদের বক্তব্য ও তার খন্ডন

বিদ 'আতীদের বক্তব্য হল মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে তিনি মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই তাঁর সম্মানার্থে কিয়াম করতে হবে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিদ 'আতীগণ এই কিয়াম করাকে জায়েয এবং মুস্তহাব হিসাবে গন্য করেন। এমনকি এটাকে ওয়াজিব ও ফরয বলেও আখ্যায়িত করেন। আর কিয়াম না করনেওয়ালাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়। (এ কথার বরাত একটু পরেই উল্লেখ করছি।)

খন্ডন

পূর্বোল্লিখিত হাদীসে স্পষ্ট রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। অথচ বিদ'আতীগণ বলেছেন তার বিপরীত। হাদীসে বর্ণিত আকীদার বিপরীত কোন বিষয় কিভাবে মুস্তাহাব এমনকি

http://islaminonesite.wordpress.com

ফরয হয়ে যায় তা বোধগম্য নয়। আর যারা হাদীসে বর্ণিত আকীদা মোতাবেক মীলাদের মজলিসে রাসূল (সাঃ) এর হাজির না হওয়ার আকীদা রাখেন, তারা কিভাবে কাফের হয়ে যান তা আরও অবোধগম্য বৈ কি? যারা কুরআন হদীসের বর্ণনা মোতাবেক আকীদা পোষন করেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা, পক্ষান্তরে যারা কুরআন হাদীসের বর্ণনার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করাটা কি কুফরি নয়?

সুতরাং ‘মিলাদ’ এবং ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় ইসলামে নব আবিষ্কার। নাবী করিম (সাঃ) এর ওফাতের ৬০০ বছর পর, ইমাম চতুষ্টয়ের ৪০০ বৎসরেরও অধিক সময় পর ‘মিলাদ’ এবং কিয়াম শব্দদ্বয় আবিষ্কৃত যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মিলাদ এবং কিয়াম আবিষ্কারের আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এটিও প্রকাশ্য বিদ’আত যা নাবী করিম (সাঃ) বা সাহাবী বা তাবা-তাবিঈ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুসৃত নয়। (তথ্যসূত্রঃ বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহম্মাদ, পৃষ্ঠা নং – ১৪০।)[101]। কয়েকটি কারনে ঈদে মিলাদুন্নাবী এবং প্রচলিত মীলাদ কেন বিদআত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

[101] বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহম্মাদ, পৃষ্ঠা নং – ১৪০

http://islaminonesite.wordpress.com

১. মহানবীর (সাঃ) জন্মদিন পালন করা যা বিজাতীয় সংস্কৃতি। যেমন হিন্দুরা শ্রী কৃষ্ণের, খৃষ্টনরা ঈসা (আঃ) জন্মদিন পালন করে।

২. রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ তার জন্য নির্ধারিত করা।

৩. প্রচলিত মীলাদ মাহফিলে অতিরঞ্জন করে দুরুদ পাঠের জন্য নিদিষ্ট করা।

৪. মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আত্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে মনে করে দাঁড়ানো।

উপরোক্ত আলোচনার পর বিষয়টি আরও বিস্তারিবতভাবে উপস্থাপন করে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের প্রায় সকল হাক্কানী ‘উলামায়ে কিরাম ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনকে নিম্নোক্ত দালীল ও সুস্পষ্ট কারণ সমূহের ভিত্তিতে বিদ‘আত ও হারাম বলে অভিহিত করেছেন। যে সব বিশুদ্ধ দালীল ও সুস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে ‘উলামায়ে কিরাম এটিকে বিদ‘আত ও নিষিদ্ধ বা হারাম, বলেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

১) এটি দ্বীনে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয়। কেননা এর পক্ষে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ও (صلى الله عليه وسلم) তাঁর কথা, কাজ কিংবা কোনরূপ অনুমোদন দ্বারা এ কাজটি প্রবর্তন করেননি। অথচ তিনি হলেন আমাদের অনুসরণীয় ও ইমাম। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.

অর্থাৎ- রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তোমরা তা অবলম্বন করো, আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো[102]।

রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেছেনঃ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ "

[102] সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

http://islaminonesite.wordpress.com

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে আমাকে অমান্য করল সে যেন আল্লাহকেই অমান্য করল। (তথ্যসূত্রঃ তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, আহমাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯। তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪।)[103]। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম-অনুপম আদর্শ; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ করে। (তথ্যসূত্রঃ সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩/২১)[104]। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) জুম‘আর খুতবায়ে ঘোষণা করেছেনঃ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) مسلم.

[103] তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪

[104] সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩/২১

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। (মুসলিম : ৮৬৭)[105]। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ- যে আমাদের এই দ্বীনের (শারী'য়াতের) মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।

২) মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে 'ঈদ উদযাপন বা অনুষ্ঠান পালন করা - এটি হলো বিপথগামী পথভ্রষ্টদের প্রবর্তিত একটি প্রথা। যেমন আমরা আলোচনার শুরুতেই জেনেছি যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নাবী পালনের প্রথা সর্বপ্রথম চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাত্বিমী 'উবায়দী শী'আ শাসকগণ প্রবর্তন করেছিল।

সুতরাং বিবেকসম্পন্ন কোন মুসলমান কি কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের বিরোধিতা করতে পারে এবং শী'আ-

[105] মুসলিম : ৮৬৭

http://islaminonesite.wordpress.com

রাফিযীদের প্রবর্তিত পথ ও প্রথা অনুসরণ করতে পারে? অবশ্যই না।

৩) আল্লাহ (سبحانه وتعالى) দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً.

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিলাম এবং ইছলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিলাম। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং – ৩)[106]

রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) আল্লাহ্‌র এই দ্বীনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এমন প্রত্যেকটি বিষয় তিনি তাঁর উম্মাতকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে গেছেন। মোটকথা, উম্মাতের জন্য কল্যাণকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি [রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)] তাঁর উম্মাতকে অবহিত করেননি এবং

[106] সূরা মায়েদা, আয়াত নং - ৩

http://islaminonesite.wordpress.com

উম্মাতের জন্য অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেননি।

আমাদের নাবী ছিলেন আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) এর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দেয়ার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকে নাসীহাত প্রদানের ক্ষেত্রে সকল নাবী-রাসূলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। যদি মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা এমন কোন দ্বীনী কাজ বা 'ইবাদাত হতো- যেটাকে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) পছন্দ করেন এবং যদ্বারা আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় উম্মাতকে তা জানিয়ে দিতেন অথবা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে এ কাজটি করতেন। কিন্তু তিনি নিজে এরূপ করেছেন কিংবা উম্মাতকে তা করতে বলেছেন মর্মে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

অর্থ- আমার পূর্বে যতো নাবী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব ছিল যতো কিছু তাদের (নিজ নিজ

উম্মাতের) জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর হিসেবে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয়া, আর যতো কিছু তাদের জন্য অকল্যাণকর বলে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা।

৪) দ্বীনে ইসলামে এ ধরনের মীলাদ বা জন্মদিবস পালনের বিদ‘আতী প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা প্রথমতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এই উম্মাতের জন্য দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেননি বরং তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই তা সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ‘আতী পন্থা প্রবর্তনের দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এই উম্মাতের কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ও প্রাপ্য ছিল তা তিনি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দেননি। তাই পরবর্তীতে এইসব বিদ‘আতীগণ শারী‘য়াতের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় (বিদ‘আত) প্রবর্তন ও সংযোজন করে দিয়ে উম্মাতের সেই দ্বীনী প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিয়েছে। (এসব জঘণ্য কথা-বার্তা ও ধ্যান ধারণা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাদের ধারণা হলো যে, এরূপ কাজের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারবে। অথচ

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন কাজ করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেননি। শুধু তাই নয় বরং এর দ্বারা প্রকারান্তরে তারা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র উপর অভিযোগ আরোপ করছে, অপরদিকে একথাই বলছে যে, রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেননি। বরং তিনি আল্লাহ (سبحانه وتعالى) প্রদত্ত রিছালাতের আমানাত খিয়ানাত করেছেন। সুবহানাল্লাহ! এরূপ ধারণা আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ও তাঁর রাসূলের (صلى الله عليه وسلم) উপর অপবাদ আরোপ ও জঘন্য মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ও তাঁর রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এরূপ অভিযোগ ও অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুতঃপবিত্র।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাহ্‌গণের উপর তাঁর এই নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنه) কে সাক্ষী রেখে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল, সে সবই তিনি উম্মাতের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন; কোন কিছুই তিনি অবশিষ্ট বা অসম্পূর্ণ রাখেননি।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫) বিদ‘আত বর্জন করার ও বিদ‘আত থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকার বিষয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর অনুসরণ করার, কথায় কাজে বা ‘আমালে তাঁর বিরোধিতা না করার বিষয়ে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে যেসব সুস্পষ্ট দালীল রয়েছে, সেসব দালীলের ভিত্তিতে হাক্বক্বানী ‘উলামায়ে কিরাম মীলাদ তথা জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন বা ‘ঈদ উদযাপনকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ‘আত বলে অভিহিত করেছেন।

৬) মীলাদুন্নাবী পালনের দ্বারা রাসূলের (صلى الله عليه وسلم) প্রতি আদৌ কোন ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় না। কস্মিনকালেও নয় বরং রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর যথাযথ অনুসরণ, তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমাল এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (সত্যিকার অর্থে যে যাকে ভালোবাসে, সে তার আনুগত্য করে থাকে)। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ:- (হে নাবী) আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো- আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮) ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন কিংবা জন্মদিবস পালনের মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ‘ঈদ বা বড়দিন পালনের সাথে মিল তথা সামঞ্জস্য রয়েছে। এর দ্বারা ‘আমাল বা কর্মে তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। অথচ আমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করতে এবং তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এর “ইক্বতিযাউস্ সিরাত্বিল মুছতাক্বীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম” গ্রন্থের; বিশেষ করে ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দু’টি পড়ুন। আরো দেখুন! ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত গ্রন্থ “যাদুল মা‘আদ”- ১/৯৫)

৯) তবে কারো ইচ্ছা হলে সে সোমবার দিন রোযা রাখতে পারে। কেননা একদা রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) - কে সোমবার দিন রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

অর্থ- এটা (সোমবার) হলো সেই দিন যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, এবং এই দিনেই আমাকে রাছূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে অথবা এই দিনে আমার প্রতি অহী (ক্বোরআন) নাযিল হয়েছে।

সুতরাং শারী'য়াতের বিধান হলো- সোমবার দিন নাফ্ল রোযা পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং কোন অবস্থাতেই মীলাদ মাহ্ফিল বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী ইত্যাদি বিদ'আতী কর্মকান্ড না করা।

১১) মীলাদ মাহ্ফিল বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন কিংবা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন উপলক্ষে অনেক রকম শারী'য়াত বিরোধী কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মাত্র দু-তিনটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) মীলাদ মাহ্ফিলগুলোতে যেসব ক্বাসীদাহ্-গজল, না'তে রাছূল ইত্যাদী পাঠ করা হয়, সেসবের বেশিরভাগের মধ্যে শিরকী শব্দ, বাক্য ও কথা-বার্তা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত এসব অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয়

থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের ('ঈসা ইবনু মারইয়াম- এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো - "আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল"।

খ) অধিকাংশ মীলাদ মাহ্‌ফিলগুলোতে বিভিন্ন রকমের হারাম কর্ম-কান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন- তাতে নারী-পুরূষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা, নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ, গাজা ইত্যাদি) পান করা হয়ে থাকে। কখনো এসব মাহ্‌ফিলে রাসূলুল্লাহ্ কিংবা অন্য কোন অলী-আউলিয়া এর নিকট আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে শির্‌কে আকবার করা হয়।

সেখানে ক্বোরআনে কারীম তিলাওয়া্তের মাজলিসে বিড়ি-সিগারেট পান করা হয়, যেটি মুলতঃ ক্বোরআন অবমাননার শামিল। অনর্থক কাজে বিপুল পরিমান টাকা-পয়সা অপব্যয় ও অপচয় করা হয়। মীলাদুন্নাবী উদযাপনের দিনগুলোতে

বিভিন্ন মাছজিদে উচ্চস্বরে-সমস্বরে তালে তাল মিলিয়ে, কোথাও কোথাও দেখা যায় হাতে জোরে জোরে তালি বাজিয়ে নানারকম বিকৃত (বিদ‘আতী) বানোয়াট যিকর-আযকারের আয়োজন করা হয়। অথচ উপরোক্ত কার্যকলাপ যে আদৌ শারী‘য়াত সম্মত নয় বরং তা হারাম তথা নিষিদ্ধ-সে ব্যাপারে সকল হাক্বানী ‘উলামায়ে কিরাম একমত; এ বিষয়ে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

উপরোক্ত আয়াত, হাদীস এবং এর সমার্থক আরো যেসব আয়াত ও হাদীছ রয়েছে- সবগুলোই প্রমাণ করে যে, রাছূলুল্লাহ এবং অন্যান্য সকল মৃত ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন নিজ নিজ ক্বাব্‌র থেকে বের হবেন। কোন অবস্থাতেই এর আগে নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌ও ঐদিনই ক্বাব্‌র থেকে বের হবেন, প্রথমে তাঁর ক্বাব্‌র-ই বিদীর্ণ হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম ক্বাব্‌র থেকে উঠবেন।

আশ্‌ শাইখ আল ‘আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায (রহঃ) বলেছেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে (সকল কালের সকল যুগের) সকল ‘উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ সম্পর্কে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বীন ইসলামের ব্যপারে এমন অজ্ঞতা আর উপেক্ষার কারণেই আমরা মুসলমানরা আজ ইসলামের নামে “মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি হতো না,” “মুহাম্মাদ (সাঃ) নূরের সৃষ্টি,” “মিলাদ মাহফিলে তিনি উপস্থিত হন,” “তিনি হায়াতুন নবী” এমন অনেক বানোয়াট কথায় বিশ্বাস করি; ‘শবে বরাত’, ‘শবে মিরাজ’, ‘জুম‘আতুল বিদা’, ‘মিলাদ’ ও ‘ঈদে মিলাদুন নবীর’ মতো অসংখ্য অনুষ্ঠান উদযাপন করে সওয়াবের নিয়তে পরিশ্রম করে গুনাহ অর্জন করি।

‘দোয়ায়ে গঞ্জে আরশ’, ‘দরুদে নারিয়া’, ‘দরূদে হাজারী’ ইত্যাদি ধরনের বিদ‘আতী ও শিরকী দরূদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠ করি। কথাগুলো শুনতে আপনার কাছে যতোই আজব মনে হোক না কেন, আসলে ব্যাপারগুলো তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য।

ইসলামের নামে আমাদের বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, এবাদত-বন্দেগী চালু রয়েছে, বাস্তবে যেগুলোর সাথে ইসলামের, আল্লাহর, তাঁর রসূলের, কুরআনের ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এ কাজগুলোকে আমরা তথাকথিত “ধর্মীয় ভাব

http://islaminonesite.wordpress.com

গাম্ভীর্যের” মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপন করে থাকি অথচ এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ বিদ’আত।

কেউ কেউ বলেন যে, মিলাদ ও মিলাদুন নবী হলো ‘বিদ‘আহ হাসানা’ বা উত্তম বিদ‘আহ। তাদের অবগতির জন্য বলবো যে, যেখানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে “কুল্লু বিদ‘আতিন দলালাহ” অর্থাৎ সকল বিদ‘আহ পথভ্রষ্টতা, সেখানে কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, “না না কিছু বিদ‘আহ আছে ভালো”, তাহলে সে কি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে চরম বেয়াদবী করলো না? সে কি নিজেকে আল্লাহর রসূলের চেয়েও অধিক জ্ঞানী বলে দাবী করলো না? (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ আমাদের এসব নব আবিষ্কৃত বিদ’আতী কাজ থেকে হেফাযত করুন, আমীন।

উপরোক্ত কারণ ও দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে কিংবা বিশেষভাবে পালন করা কিংবা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন বা উদযাপন করা দ্বীনে ইছলামে নব-আবিষ্কৃত একটি বিদ‘আত ও শারী‘য়াত বহির্ভূত কাজ- যা অবশ্যই বর্জনীয়। (তথ্যসূত্রঃ নুরুস্‌ সুন্নাহ ওয়া যুলুমাতুল বিদ‘আহ।)

(৪) বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদআতঃ

প্রচলিত বিবাহ প্রথা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান বা রসমগুলো যা ইসলাম শরঈ সমর্থন করে না বরং এসব অনুষ্ঠান মূলতঃ টাকার অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের খুশির ও আনন্দের জন্য ২টি ঈদ দিয়েছেন আর আমরা চিন্তা করি কি করে আরো খুশির ও আনন্দের দিন আমাদের মাঝে আনা যায় – নবী (সাঃ) যে গুলো আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে নুতন কিছু বা অনুষ্ঠান যুক্ত করা বিদআত । আমরা যদি ৯৫% ইসলাম মেনে চলি আর ১% থেকে ৫% অন্য কোন ধর্ম থেকে নিয়ে মেনে চলি তাহলে এটা আর ইসলাম থাকে?

সুরা আল ইমরান (৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর উপর) ইমান এনেছো, তোমরা যদি অমুসলিদের অনুসরন করতে শুরু করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।ফলে তোমরা নিদারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। সুরা বাকারা (২) ২৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – তোমরা যা কিছু খরচ করো আর যা কিছু মানত করো আল্লাহ তা নিশ্চই জানেন,যালেমদের কোন সাহায্যকারি নাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিরমিযী শরীফ - মিনা বুক হাউস - কিয়ামত অধ্যায় - ২৩৫৮ নং হাদিস -মাসুউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেন, রোজ কিয়ামতে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তার একটি হল তুমি তোমার ধন সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছো এবং কোন খাতে ব্যবহার করেছো? মেশকাত গ্রন্থ - সালাউদ্দিন বই ঘর - ৬ষ্ট খন্ড - ৩০৭৩ নং হাদীস - আনাস (রাঃ) বলেন নবী (صلى الله عليه وسلم) যয়নবের বিয়েতে যত বড় বিবাহ ভোজ করেছেন তা অন্য কোন বিবির জন্য করেনি,তাতে তিনি একটা ভেড়া দিয়ে বিবাহ ভোজ করিয়েছেন । অতএব, বিবাহের সময় অনুস্ঠান বা বিবাহ ভোজ একটা (যে পক্ষই অনুস্ঠান করুক বা উভই পক্ষ একত্রে অনুস্ঠান করুক) এগুলো বিদআত কেন – নবী (صلى الله عليه وسلم) এর সময় লোকজন বিয়ে করেছে ও নবী (صلى الله عليه وسلم) অনেকের বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নবী (صلى الله عليه وسلم) বৌ ভাত, গায়ে হুলুদ অনুস্ঠান করেনি এজন্য এগুলো বিদআত। [নবী (صلى الله عليه وسلم) মাগরিবের নামায পড়েছেন ৩ রাকাত এখন আপনি কি ৪ রাকাত নামায পড়বেন মাগরিবে? তিনি বিয়ের নিয়ম আমাদের বলে দিয়ে গেছেন?] মিশকাত শরীফ - সালাউদ্দিন বইঘর-৬ষ্ট খন্ড-৩০৮০ নং হাদিস আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন সর্বাপেক্ষা মন্দ সে অলীমার ভোজ (বিবাহ ভোজ) যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর

গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। আমাদের উচিৎ যাদের বিবাহ ভোজে যাচ্ছি তাদের জন্য দোয়া করা। সেইটা অধিকাংশ লোকই আমরা করি না। গিফট বা উপহার সামগ্রী না নিয়ে গেলে মান সম্মান থাকবে না অথচ গিফট বা উপহার সামগ্রী বিবাহ ভোজের অংশ না, দোয়া বিবাহ ভোজের অংশ।(গিফট বা উপহার সামগ্রী দেওয়া যাবে না তা না, কিন্তু আমাদের দোয়া করা উচিত।

যাই হোক, বিয়ে যেহেতু আমাদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। তেমনি আমাদের সমাজে বা দেশে প্রচলিত যেসব প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সেগুলো আমরা বর্জন করা উচিৎ। বিয়ের সময় যৌতুক, গায়ে হলুদ বা গান বাজনা করা ইত্যাদি বিদাত বা হারাম তা আমরা সবাই জানি। এগুলো ছাড়াও আরোও কিছু কুপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। তাই আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিয়ে সংক্রান্ত কিছু বিদ'আত ও হারাম বিষয় নিয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১। পালিয়ে বিয়ে করাঃ মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে বিয়ে করা ইসলামে হারাম। অর্থাৎ মেয়ের শরীয়ত সম্মত অবিভাবক ছাড়া বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য

নয়। নবী করিম (صلى الله عليه وسلم) বলেন- “ওলী ছাড়া বিয়ে হয়না।” আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত – কোন মহিলা তার ওলীর বিনা অনুমতিতে নিজেই বিয়ে করে ফেললো তার সম্বন্ধে নবী করিম (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল (তিনবার বলেছেন)।” ওলী অর্থ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত অবিভাবক। অপরপক্ষে একটি ছেলে তার অবিভাবকের সম্মতি ছাড়াও বিয়ে করতে পারে। তাই আজকের যুব সমাজে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজের ক্ষেত্রে অন্তত মেয়ে পক্ষের অভিবাবকের অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া সে বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য হবেনা। তবে যদি কোন মেয়ে মনে করে যে তার বাবা মা কোন কিছুর লোভে বা কারও ভয়ে তাকে কুপাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চাচ্ছে বা তাদের কে বোঝানো যাচ্ছেনা আবার বিয়েতে রাজী না হলে কোন প্রকার সমস্যা হবে অথবা ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যার কারনে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বিয়ে করা উচিৎ।

২। মেয়ে দেখাঃ মেয়ে দেখার ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের মহিলারা ও পাত্র নিজে দেখতে পারেন। অন্য কোন পুরুষ লোক মেয়ে পক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু মেয়ে দেখতে পারবেন না। তবে পাত্রের নিজে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী

http://islaminonesite.wordpress.com

করীম (صلى الله عليه وسلم) সাহাবীদের নিজের চোখে পাত্রী দেখে পছন্দ করতে নির্দেশ বা উপদেশ দিয়েছেন। যেমনঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন নবী করীমের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি আসল। সে রাসূলে করীম (সাঃ) - কে জানাল যে, সে আনসার বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করেছে। এই কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাহকে দেখেছ? লোকটি বলিল, না। রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ তা হলে এখনই চলে যাও এবং তাকে দেখ। কেননা আনসার বংশের লোকদের চক্ষুতে একটা কিছু আছে। (সহীহ মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি হতে মোট দুটি কথা জানা যায়। একটি এই যে, নবী করীম (সাঃ) আনসার বংশের লোকদের চোখে একটা কিছু থাকার কথা বললেন এমন ব্যক্তিকে যে সেই বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রাসূলে করীম (সাঃ) আনসার বংশের মেয়ের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেই মেয়েটিকে দেখেছ কিনা? সে যখন দেখে নাই বলে জানাল, তখন নবী করীম (সাঃ) মেয়েটিকে দেখার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রথম কথাটি সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেনঃ এই রূপে বলা কল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। এটি কোন গীবত নয়, নয় তারও বিষয়ে মিথ্যা দুর্নাম রটানো বা কোন রূপ বিদ্বেষ ছড়ানো বরং একটা প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচিত করা মাত্র। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে যদি এমন কিছু থাকে যা অন্য লোকদের পছন্দনীয় নাও হতে পারে, তা হলে সেই মেয়েকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের নাও হতে পারে। তাই পূর্বাহ্নেই সে বিষয়ে জানিয়ে দেয়া কল্যাণকামী ব্যক্তির দায়িত্বও বটে।

কিন্তু আনসার বংশের লোকদের চোখে কি জিনিস থাকার কথা রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন? কেউ কেউ বলেছেন, আনসার বংশের লোকদের চক্ষু আকারে ক্ষুদ্র হত। আর ক্ষুদ্র চোখ অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করে না। কেহ কেহ বলেছেন যে, তাদের চক্ষু নীল বর্ণের হত, যা অনেক লোকেরই অপছন্দ। রাসূলে করীম (সাঃ) এই দিতেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোট কথা, এটি কোন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণাও নয় বরং রাসূলে করীম (সাঃ) - এর দ্বিতীয় কথাটি হতে জানা যায়, যে মেয়েকে বিবাহ করা হবে, তাকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহ করার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে বিয়ে-করা-মেয়েটিকে দেখেছিল কিনা, এটিতে দুটির তাৎপর্য হতে পারে? হয় এটি হবে যে, বিবাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

করার পূর্বে তাকে দেখেছে কিনা নতুবা এই হবে যে, বিয়ে করার পর-পরই তাকে দেখেছে কিনা। আলোচ্য লোকটি বিবাহ করেছে, এই সংবাদ দেয়ার পর নবী করীম (সাঃ) তাকে চলে যেতে ও তাকে দেখতে বললেন- দেখতে হুকুম করলেন। অতএব, হাদীস আলোচনায় বলা যায় যে, প্রচলিত সামাজিক নিয়ম আমাদের দেশে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত পরিপন্থী। তাই এই সব নতুন নিয়ম বিদ'আত এবং বাতিল বলে বিবেচিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

৩। মেয়ের কবুল বলাঃ আমাদের সমাজে আরেকটি বিদাত হচ্ছে বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা। বস্তুত মেয়ের কবুল বলার কোন প্রয়োজন বা বিধান নেই। বিয়ের দিন মেয়ের অবিভাবক মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিলে ছেলে কবুল বল্লেই বিয়ে হয়ে যায়। তাই বিয়ের দিন মেয়ের কোন কাজ নেই। অভিবাবক আগেই মেয়ের অনুমতি নিয়ে নিতে হয়। উল্ল্যেখ্য মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবেনা। যেমন রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি হচ্ছেঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ পূর্বে স্বামীসঙ্গ প্রাপ্তা কনের স্পষ্ট আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং পূর্বে স্বামী অ-প্রাপ্তা কনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা

করলেন, তাহলে অনুমতি কিভাবে নেয়া যেতে পারে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তার চুপ থাকাই হলো (অনুমতি)। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম, বুখারী, নাসায়ী)। পক্ষান্তরে আরেকটি হাদীসের উদাহরন এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমনঃ যরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূল! কুমারী মেয়ে তো বিবাহের অনুমতি দিতে লজ্জাবোধ করে। তা হলে তার অনুমতি পাওয়া যাবে কিভাবে? রাসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি ও রাযী থাকা বুঝাবে। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম)। অতএব, হাদীসগুলো আলোচনা করে বলা যায় যে, প্রচলিত আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতিতে তথা বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা শরীয়ত সম্মত নয় তথা বিদ'আত।

৪। ওকিল বানানোঃ বিয়ের দিনে ওকিল ও সাক্ষী দিয়ে মেয়ের অনুমতি নেয়ার প্রথা আমাদের দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত। মেয়ের অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব তার অবিভাবকের। তাই বাইরের কোন লোক, ওকিল বা সাক্ষী ইত্যাদি ইসলাম সম্মত নয়।

৫। কবুল বলার পর সালাম করাঃ আমাদের দেশে আরেকটি বিদাত হলো কবুল বলার পর বর দাড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। আসলে সালাম করতে হয় কারও সাথে দেখা হলে বা

কোথাও গেলে বা বিদায় নেওয়ার সময়। বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝখানে দাড়িয়ে এভাবে সালাম দেয়ার প্রথা নবী(সঃ) এর আমলে ছিলোনা অর্থাৎ তা পরে আবিস্কৃত।

৬। বিয়ের মোহরানাঃ বিয়ের মোহরানা নির্ধারনের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্মান বিবেচনা করে অসম্ভব বা অসাধ্য পরিমান মোহরানায় রাজী হওয়া বা বরপক্ষকে চাপ দিয়ে রাজী করানো ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নয়। নবী করীম (সাঃ) নগদ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছেন বা সাহাবীদের সাধ্যমতো মোহরানা দেয়ে বিয়ে পড়িয়েছেন। মোহরানা হতে পারে টাকা পয়সা, জমিজমা, অলংকার এমনকি জ্ঞান বা শিক্ষাও হতে পারে।

৭। বিয়ের অনুষ্ঠানঃ আমাদের দেশের প্রচলিত বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্ঠান করে লোক দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়। ইসলামী দৃষ্টিতে মেয়ে পক্ষের অনুষ্টান করা বা লোক খাওয়ানোর কোন বিধান নেই। তবে বরপক্ষের লোকদের জন্য মেহমানদারী করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক নিয়মের চাপে পড়ে বাবা মা ধারদেনা করে বিয়ের আয়োজন করে আর বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে ধুমধাম করে এসে দাওয়াত খায়। উপরন্তু খাবার দাবারে সমস্যা হলে মেয়ে পক্ষকে দু একটি কথা না শুনিয়ে ছাড়েনা। বস্তুত

এসবই ইসলামের নিয়মের বাইরে আমাদের সামাজিক প্রথা যা একেতো অন্যায় এবং তা ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ন ।

৮। মালামাল দেয়াঃ বিয়েতে কনে পক্ষ বিয়ের দিন বরের বাড়ীতে যে মালামাল পাঠায় তাও ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জ্যস্য পূর্ন নয়। এগুলো বেদাত এবং তাতে মেয়ে পক্ষের উপর খরচের চাপ পড়ে। এবং এ খরচ মিটাতে গিয়ে মেয়ের বাবা মা ধার দেনা গ্রস্থ হয়ে পরেন।

৯। উপহার নেয়াঃ আমাদের দেশী বিয়েতে উপহার নেওয়ার প্রথা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিয়েতে উপহার নিয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। গেইট দিয়ে ঢুকেই উপহার গ্রহনকারী লোক জনের মুখামুখি হতে হয়। এতে যারা উপহার নিয়ে আসেন নি বা উপহার আনার সামর্থ যাদের নেই তারা ভীষন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন। উপহার লিপিবদ্ধ করার কারনে দামী উপহার না দিলে সামাজিক অবস্থান হারানোর একটা আশংকা থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে দামী উপহার দিতে বাধ্য হন। ওনেকে উপহার সামগ্রী দেওয়ার অসামর্থের কারনে বিয়েতে আসেন না। উপহার সামগ্রী দেওয়া একটা সওয়াবের কাজ কিন্তু এভাবে পরোক্ষ চাপ দিয়ে উপহার সামগ্রী আদায় করা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক।

http://islaminonesite.wordpress.com

১০। **ওয়ালিমা না করাঃ** আমাদের দেশ প্রচলিত বিয়েতে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্টান করলেও ছেলে পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে ওয়ালিমা করেনা। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরো উল্টা সিষ্টেম। ইসলামে মেয়ে পক্ষের অনুষ্টান করা বা লোক খাওয়ানোর বিধান নেই কিন্তু ছেলে পক্ষের ওয়ালিমা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিছু কিছু আলেম ওয়াজিব ও বলেছেন। নাবী করীম (সঃ) সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওয়াফ (রাঃ) এর বিয়ের পর তাকে বল্লেন যে, কমপক্ষে একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো। ওয়ালিমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে গরীবদের অবশ্যই প্রাধ্যন্য দিতে হবে। আবু হুরায়রা(রাঃ) কতৃক বর্নিত, ”নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ঠ খাবার হচ্ছে সে ওয়ালিমার খাবার যেখানে ধনীদেরকে তো ডাকা হয় কিন্তু ফকির গরীবদের কে ডাকা হয়না।” তিনি আরও বলেন- ”যে ব্যাক্তি ওয়ালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিলো সে আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর সাথে নাফরমানী করলো।” তাই কোন জরুরী কোন কাজ বা সমস্যা না হলে অবশ্যই ওয়ালিমার আসতে হবে।

১১। **মেয়ে পক্ষের খরচ করাঃ** ইসলাম সম্মত বিয়েতে বিয়ের সময় বা বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ে পক্ষের খরচ করার মতো তেমন কিছু নেই। বিয়েতে মোহরানা দিবে ছেলে। ওয়ালিমা করবে ছেলে। কনে ঘরে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনী ঘরের

http://islaminonesite.wordpress.com

আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করবে ছেলে। অথচ আমাদের দেশে হয় ঠিক তার উল্টো। যৌতুক দেয় মেয়ে পক্ষ, অনুষ্ঠান করে লোক খাওয়ায় মেয়ে পক্ষ, মেয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার বা আসবাব দেয় মেয়ে পক্ষ। এসবই হচ্ছে বিদাতী প্রথা।

১২। কাজিনদের মেয়ে বিয়ে করাঃ আমাদের অনেকের ধারনা যে মামাতো বোন, খালাতো বোনদের মেয়ে বিয়ে করা জায়েজ নয় কারন তারা আমাদের ভাগ্নি বা ভাতিজী হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের বিয়ে করা জায়েজ।

১৩। আরও কিছু প্রথাঃ আরও কিছু কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যেমন, বিয়ের পরে মেয়ে কর্তৃক শশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়া। এটা বিদাতী প্রথা। বিয়ের আগে এ্যাংগ্যাজমেন্ট সময় আংটি দেয়াও ইসলামী রীতি নয়। এটা আমাদের দেশের রীতি। যদি ছেলে নিজে মেয়ের হাতে আংটি পড়িয়ে দেয় তবে তা হারাম হবে কারন বিয়ের আগেই মেয়ের হাত স্পর্শ করা হারাম। বিয়ের পরে মেয়ে পক্ষের পক্ষ হতে রমজানে ইফতার দেয়া, মৌসুমী ফল পাঠানো, ঈদের সময় কাপড় চোপর পাঠানো ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চাপ প্রয়োগ করা বা সামাজিক চাপের কারনে মেয়ে পক্ষ তা দিতে সম্মত হলেও তাদের

কষ্ট হবে জেনেও ছেলে তা পাঠাতে বারণ না করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। এটি জুলুম ও বটে।

আমাদের সমাজে কিছু বিত্তবান আছেন যারা মনে করেন যে, তাদের সামর্থ্য আছে তাই তারা মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে ঘটা করে লোক খাওয়াবেন বা মেয়ের সাথে আসবাব পত্র দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। উপহার সামগ্রী দেওয়া ভালো কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের খেয়াল রাখা উচিৎ তাদের এই কাজের ফলে একটি বিদ'আতী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না যাতে পরে অন্য একজন অসামর্থ্যবান পিতা তার মেয়ের বিয়েতে তা করতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বাধ্য হন। যদি তাই হয় তাহলে তাই এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার কারনে ঐ বিত্তবান ব্যাক্তি গোনহগার হবেন। সবচেয়ে ভালো হয় উপহার সামগ্রী সবার অগোচরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রদান করা। (তথ্যসূত্রঃ উক্ত লিখাটি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত শায়খ মতিউর রহমান এর ওয়াজ "বিবাহ নবীগনের সুন্নাত" এর অবলম্বনে লিখেছি।)[107]

(৫) নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করাঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য সকল নামাযের শুরুতে নাওয়াইতু বলে

[107] ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত শায়খ মতিউর রহমান এর ওয়াজ "বিবাহ নবীগনের সুন্নাত" এর অবলম্বনে লেখা।

মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি বিদআত। কারণ এটা রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাতে নেই। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাও? অথচ আল্লাহ্ তায়া'লা আকাশ-যমীনের মধ্যকার সকল বস্তুসম্পর্কে অবগত আছেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (সূরা হুজরাতঃ ১৬)।

নিয়ত বিষয়ে সহীহ হাদীসও আছে। সহীহুল বুখারীতে হাদীসটি এসেছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. "

(তথ্যসূত্রঃ সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১।)

হুমায়দী (রহঃ) .... 'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

- কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে - সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।"
অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নিয়তের স্থান অন্তর। এটা অন্তরের কাজ, মুখের কাজ নয়। মুখে নিয়ত উচ্চারণের পক্ষে কোন সহীহ তো দূরের কথা, কোন যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবেঈ বা চার ইমামের কোন ইমাম এভাবে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। এটা কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তির তৈরী করা প্রথা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিয়ত শব্দের অর্থঃ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা। আর তা অন্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুখের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কোন কিছু করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করলেই সে কাজের নিয়ত হয়ে গেল। তা মুখে বলতে হবেনা।

(৬) ফরজ নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করাঃ

আমর বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা

http://islaminonesite.wordpress.com

একবার ফজরের নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আগমণ করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তাঁর কাছে গেলাম। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহআন! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। তিনি বললেন সেটি কি? আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম মসজিদে একদল লোক গোলাকার হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। সেই দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশতবার আল্লাহু আকবার পাঠ কর। এতে সকলেই একশতবার আল্লাহু আকবার পাঠ করে। তারপর বলে একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে থাকে।

তারপর লোকটি বলে এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে থাকে। একথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবেনা। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নাই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার (বৈঠকের) কাছে এসে উপসি'ত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, একি করছ তোমরা? তারা সবাই বলল পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে, তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবেনা। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয়না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মাত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে

http://islaminonesite.wordpress.com

তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে?!! এখনও নবী মুহাম্মাদের অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় এখনও পূরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসন গুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উম্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন, অনেক কল্যাণকামী আছে, যে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত ন্তপৌঁছতে পারে না। আল্লাহর নবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমর ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি কারণে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এ ভালকাজগুলো অপছন্দ করেছেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রথমতঃ তাস্‌বীহ পাঠ করার জন্য গোলাকার হয়ে বসা।

দ্বিতীয়তঃ তাসবীহ্ সমূহের সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করা। তৃতীয়তঃ পাথরের মাধ্যমে হিসাব করে এগুলো পাঠ করা। কেননা তাসবীহ্ পাঠের উল্লেখিত পদ্ধতির কোনটিই রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়।

সতুরাং, জিকিরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত জিকিরগুলো একা একা পাঠ করবে। অতএব, সালাত শেষে বা সালাতের আগে দলবদ্ধভাবে যিকির করা বিদ'আত যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই এইসব কাজ আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(৭) উচ্চে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করাঃ সূফীদের যত জিকির রয়েছে তার সবই বানোয়াট ও বিদআতী যিকির। কেননা এগুলো সবই হাদীসে বর্ণিত শরীয়ত সম্মত জিকিরের পরিপন্থী। তাছাড়া দলবদ্ধ হয়ে উচ্চে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকির করা যেমনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির, আল্লাহু আল্লাহু বলে জিকির করা, জিকিরে যলী,

http://islaminonesite.wordpress.com

জিকিরে খফী, জিকিরে রূহী, জিকিরে কলবী ইত্যাদি সবই ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি তথা বিদআত বা ইসলাম বহির্ভুত কাজ।[108]

(৮) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদআতঃ মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য কুলখানি, চল্লিশা, হাফেজ-আলেমদের দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম, সবীনা খতম পড়িয়ে মৃতের রূহের উপর বখশানো, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, ফাতেহা খানি, ইসালে সাওয়াব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণ বিদআত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। এ সমস্ত- অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে হাদীয়া ও টাকা-পয়সা গ্রহণ বা প্রদান করা সম্পূর্ণ হারাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. (الحشر)

'যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই পূর্বে

108 (তথ্যসূত্রঃ ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী। দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত : জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।)

http://islaminonesite.wordpress.com

ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা কর।’ **[সুরা হাশরঃ ১০]**[109]
এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল মুসলিম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তাই বুঝে আসে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দুআ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যদি এটা তাঁদের জন্য কল্যাণকর না হত, তবে আল্লাহ তা করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন না। এমনিভাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ-প্রার্থনা করার কথা কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عن أبي أسيد الساعدي قال سأل رجل من بني سلمة فقال يارسول الله هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما بعد موتهما، فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.رواه أبو داود وابن ماجة

সাহাবী আবু উসাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ আছে যা করলে পিতা-মাতার উপকার

---

109 সূরা হাশর, আয়াত ১০

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আছে। তাহল, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা। উভয়ের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। [তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ][110]

উপরোক্ত কুরআন ও সঠিক হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারনে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসাধারন কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তার কাজগুলো বিদআত ও সুন্নাহ পরিপন্থী হওয়ার কারণে গুনাহ হয়। ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন দেখা যায় যে, হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে তা পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদআতের আশ্রয় নেয়া হয়। এমন কাজ করা হয় যা কোনভাবেই মৃত ব্যক্তির কল্যাণে আসে না এবং এগুলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে, তার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে দাফন করা ও দাফনোত্তর যতসব কাজ বিভিন্ন

[110] আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

এলাকা ওঅঞ্চল ভিত্তিক কালক্রমে নতুন নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে তা সবই বিদ'আত ও নাজায়েয । **যেমনঃ**

1. মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনার নামে তাহলীল পড়ানো,
2. কুরআন খতম পড়ানো মত ব্যক্তির চার পাশে বসে কুরআন পাঠ করা
3. গোসলের জন্য গরম পানি দেওয়ার জন্য পাক ঘরের চুলা বাদ দিয়ে বাইরে চুলা করেগরম পানি দেয়া
4. মৃত ব্যক্তিকে যেখানে গোসল দেওয়া হয় সে স্থান ৪দিন কিংবা ৪০ দিন পর্যন্ত বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা এবং রাতের বেলায় সেখানে মোম, হ্যারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলোকিত করে রাখা,
5. জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহু রাব্বী, মুহাম্মাদুন নবী কিংবা কালিমা শাহাদাৎ পাঠ করা,
6. জানাযা কবর স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় খাটিয়ার উপর আগর বাতি জ্বালানো এবং জানাযার যাত্রীদের উপর গোলাপ জল ছিটানো,
7. কবর স্থানে জানাযা নেয়ার সময় খাটিয়াকে ছাতা বা কোনো আচ্ছাদন দিয়ে ছায়াদান করে নিয়ে যাওয়া,
8. জানাযার ছালাত শেষে "এ মানুষটি কেমন ছিল "উপস্থিত সবাই "বেশ ভালো ছিল " একথা বলা,

http://islaminonesite.wordpress.com

9. জানাযার ছালাতের পূর্বে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেয়া,
10. জানাযা পড়ানোর সময় ইমামের একখন্ড সাদা কাপড় জায়নামায হিসেবে ব্যবহার করা -যা মূলত কাফনের কাপড়ের অংশ বিশেষ,
11. জানাযার ছালাত পড়ার পর পুনরায় খাটিয়ার সামনে দু'আ করা ঐ সময় ক্বিয়াম করা ছালাত ও সালাম পেশ করা,
12. জানাযার ছালাতের পর মত ব্যক্তিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য মুখের কাফনখোলা,
13. কাফনের উপর যে কোনো রকমের দুআ লিখে দেয়া কিংবা দুআ লিখিত কাপড় খন্ডকাফনের সাথেলাগিয়ে দেয়া,
14. কোনো কাপড় খন্ডের উপর কালিমা লিখে ঐ কাপড় খন্ড কবরের ভেতর মৃতের ডান পাশেমুখ বরাবর কবরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া,
15. কবরের উপর পুস্পস্তবক অর্পণ করা,
16. দাফন করার সময় প্রথম তিন অঞ্জলি মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে মিনহা খালাকনাকুমওয়া মিনহা ...... ” কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করা,

17. দাফনের পর দুআ করার পূর্বে একবার সূরা ফাতিহা তিনবার সূরা ইখলাছ্ব. একবারসূরা ফালাক্ব একবার সূরা না -স এভাবে কুরআন মাজীদ থেকে কোনো সূরা বা আয়াতপাঠ করা,
18. দাফন ও দুআ শেষে সবাই চলে আসার পর একজন বসে কবর তালক্বীন করা, * কবর পাকা করা ও তাতে মৃত ব্যক্তির নাম ফলক করা,
19. কবরের উপর ঘর তৈরি করা বা মাযার নির্মাণ করা,
20. মৃত্যুর পর চার দিন পর্যন্ত কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ফাতিহা পড়ানো,
21. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত আত্মীয় -স্বজন কত্রিক পালা ক্রমেখানা পাঠানো,
22. মৃত্যুর পর চার দিন বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মোল্লা – মৌলভী দিয়ে প্যান্ডেল টাঙ্গিয়ে কবর পাহারা দেয়া,
23. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো ও খানা পাক না করা,
24. মৃত ব্যক্তি রাস্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতীয় নেতা-নেত্রী হলে অথবা সামরিক ব্যক্তি হলে দাফনের সময় তোপধ্বনি করা ও যুদ্ধের বাজনা বাজানো,

25. জানাযার ছালাতের সময় জুতা -স্যান্ডেল পাক থাকলেও খুলে রাখা (সুন্নাত হল জুতা -স্যান্ডেল খুলে না রাখা),
26. জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর 'ছানা পড়া, (সুন্নাত হল 'ছানা না পড়ে সূরা ফাতিহা পড়া),
27. মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আযান দেয়া,
28. নেককার বা বুযুর্গ ব্যক্তি হিসেবে কোনো কবরে বিছানা-বালিশ দেয়া,
29. মৃত্যুর পূর্বেই কবর খনন করে রাখা,
30. মৃত ব্যক্তির কাযা নামায থাকলে কিংবা মৃত ব্যক্তি বেনামাযী হলে তার নামাযের আর্থিক কাফফারা হিসাব করে কাফফারা আদায় করা এং এ মৃত ব্যক্তি গরীব লোক হলে কাফফারার পরিবর্তে একটি কুরআন মাজীদ কাউকে হাদীয়া প্রদান করে কাফফারা এসক্কাত্ব (দূরীভূত করা) ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখিত কাজসমূহ বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত। এসব কাজের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। অর্থ্যাৎ আল্লাহর যেমন এসব কাজ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, তেমনি সাহাবায়ে কেরাম এসব কাজ করেছেন বলে কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, যে কাজ আল্লাহর রাসূল কিংবা তার সাহাবাগণ হতে পাওয়া যাবে না। তা কোন শরঈ

http://islaminonesite.wordpress.com

কাজ বলে গণ্য হবে না। অথচ আমাদের দেশের নানান জায়গায় ইসালে সাওয়াব-মাহফিলের আয়োজন করতে দেখা যায় যা বা উক্ত কাজগুলো ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয় এবং স্পষ্ট বিদ’আত। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা। যেমন: কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিকে ঈসালে সাওয়াব করে, আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না, কারণ এটা মৃত ব্যক্তির আমল নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)

(আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।) [সূরা নাজম: ৩৯]। এ তিলাওয়াত জীবিত ব্যক্তির চেষ্টা বা আমল, এর সাওয়াব সে নিজেই পাবে, অন্য কাউকে সে ঈসালে সাওয়াব করার অধিকার রাখে না। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু‘আ করতেন, যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।" [ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন। বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবের বিবেচনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।[সূরা তওবা: ১২৮]।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করেছেন।সুতরাং, আধুনিককালে সমাজে কবর যেয়ারত নিয়ে যেসব কাজসমূহ দেখা যায় তা বিদ'আত।

সুতরাং, মৃত ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ নাজায়েজ ও বিদআত বলে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই সহীহ হাদীস অনুযায়ী সত্যিই নাজায়েয এবং বিদা'ত। আর বিদা'ত হলো – গোমরাহী যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(৯) জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআমুনাজাতঃ

আমাদের দেশের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, জানাযা নামাজ পড়া হলে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার জন্য মাগফিরাত কামনার জন্য দুআ-প্রার্থনা করে। অথচ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এরূপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। জানাযা নামাজে তার জন্য দুআ-মুনাজাত শেষ করে আবার সাথে সাথে দুআ-মুনাজাত করার মধ্যে কি হিকমত থাকতে পারে? উদ্দেশ্য হতে পারে, আল্লাহকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, হে আল্লাহ! মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মুনাজাত করার যে পদ্ধতি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমাদের শিখিয়ে গেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমরা আবার আমাদের পছন্দ মত নিয়মানুসারে আমাদের মত করে দুআ-মুনাজাত করে নিলাম। জানাযা নামাজ শেষে দুআ-মুনাজাত করার অনুমোদন নেই। তবে দাফন শেষে কবরের কাছে দুআ করার অনুমোদন আছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন তখন তার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং তার অবিচল থাকার জন্য দুআ কর। কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। (তথ্যসূত্রঃ **আবু দাউদ**)।

(১০) কুলখানি বা চল্লিশা পালনঃ মানুষ মারা যাওয়ার কুলখানি বা চল্লিশ পালন করা বিদ্‌আত। পরে মৃতের কুলখানি বা চল্লিশা উপলক্ষ্যে খানার আয়োজন করা অথবা চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শোক পালন করা, মৃত্যুর পর প্রথম ঈদকে বিশেষভাবে শোকদিবস হিসেবে পালন করা, সে দিন কুরআনের হাফেয বা কারী সাহেবদের

ডেকে কুরআন পড়ানো এবং শোক পালনের জন্য লোকজন একত্রিত করা ইত্যাদি সবই বিদ'আত এবং হারাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন "আমরা মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগনের কাফন-দাফন সম্পন্ন করে মৃতের বাড়ীতে একত্রিত হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে খাবারের আয়জন করাকে 'নাওহা' এর মতই মনে করতাম।"

ইমাম আহমদ বলেন, "এটি একটি জাহেলী কাজ।" নাওহা অর্থঃ কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, শরীরে আঘাত করা, চুল ছেড়া, জামা-কাপড় ছেড়া ... ইত্যাদি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, শোক পালনের জন্য মজলিস করা অপছন্দীয় কাজ। এমনকি ইমাম আওযায়ীও অনুরূপ বলেছেন। [তথ্যসূত্রঃ মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি? – সম্পাদনায়ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ৩৮][111]

অতএব, চল্লিশা পালন কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। তাই এসব কাজ করা ইসলামে হারাম।

---

111 মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি? – সম্পাদনায়ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ৩৮

http://islaminonesite.wordpress.com

(১১) মৃত্যুবার্ষিকী পালন করাঃ আমাদের সমাজে যেমন জন্ম-দিবস পালনের রেওয়াজ আছে তেমনি আছে মৃত্যু দিবস পালনের প্রথাও। এ প্রথাটি সম্পূর্ণ বিধর্মীদের। ইসলাম বা মুসলমানদের আচার নয়। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল, মুসলিমগণ কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের এ প্রথা মত আমল করে যাচ্ছে। যদি এটাকে ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয় তবে তা বিদআত হিসেবে একটা গুনাহের কাজ বলে পরিগণিত হবে। আর যদি সমাজে প্রচলিত প্রথা হিসেবে করা হয় তবে তা অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণের দোষে দুষিত হবে, যা নি:সন্দেহে একটি মারাত্মক অপরাধ ও নিষিদ্ধকর্ম। অথচ আজকে আমাদের সমাজে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মৃত বার্ষিকী অত্যন্ত জমজমাট ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে বিশাল খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। যদিও গরীব শ্রেণীর চেয়ে অর্থশালীদের মধ্যে এটা পালন করার ব্যাপারটি বেশি চোখে পড়ে কিন্তু আমরা কজনে জানি বা জানার চেষ্টা করি যে, মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা কারো মৃত্য উপলক্ষ্যে শোক দিবস পালন পালন করা জঘন্যতম বিদ্'আত? অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ উপলক্ষ্যে শামিয়ানা টাঙ্গানো, ঘর-বাড়ী সাজানো, আলোকসজ্জা করা এবং কুরআন তেলাওয়াত বা বিভিন্ন তাসবীহ-ওযীফা ইত্যাদি পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব

http://islaminonesite.wordpress.com

মৃতব্যক্তির রূহের উদ্দেশ্যে বখশানো বিদ'আত। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রাঃ) বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে ছায়া দিতে পারে কেবল তার আমল; তাঁবু টানিয়ে ছায়া দেয়া সম্ভব নয়।"

(১২) রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খেলাফয়ে রাশেদীনের রূহের প্রতি ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের পর এই বিশ্বাস সহকারে সূরা ফাতিহা পড়া বিদ'আত যে, এ সকল পবিত্র রূহসমূহের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পড়লে তাঁরা মৃত্যুর পর গোসল দেয়ার সময় এবং কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় উপস্থিত থাকবেন। আফ্সোস! এটা কত বড় মূর্খতা এবং গোমরাহী! এসব কথার না আছে ভিত্তি; না আছে দলীল। এদের বিবেক দেখে বড় করুণা হয়। অনুরূপভাবে, কোথাও কোথাও নামাযের শেষে দু'আ শেষ করে করে মৃতের ফাতিহা পাঠের রেওয়াজ দেখা যায়। কোন জায়গায় জুমআর নামায শেষ করে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের নিয়ম চালু রয়েছে। এসবই বিদ'আত। অনুরূপভাবে কোন কবর বা মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং হাত উঠিয়ে কবর বা মাযারে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করা, আবার সে মৃত ব্যক্তির নিকটে ফরিয়াদ করা বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা,

http://islaminonesite.wordpress.com

মৃত মানুষের দাফন শেষে গোরস্থান থেকে ফিরে আসার সময় চল্লিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করা এবং সাধারণ মৃত মুসলমানদের রূহের উদ্দেশ্যে সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে ফাতিহা পড়া শুধু মূর্খতাই নয় বরং বিদ'আত। অতএব, বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু'আ করতেন যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমা্দের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।" [তথ্যসূত্রঃ ইবনে মাজাহঃ ১৫৩৬][112]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব

[112] তথ্যসূত্রঃ ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬

http://islaminonesite.wordpress.com

কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবরে বিবেচিনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)

“নিশ্চই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা তওবা: ১২৮][113]

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করছেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন তারা কবর যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু‘আ

[113] সূরা তওবা: ১২৮

http://islaminonesite.wordpress.com

করতেন ও নিজের নসহিত হাসিল করতেন। তারা মৃতদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেন নি। তাই প্রমাণিত হল যে, কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বিদ'আত।

(১৪) কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ'আতঃ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবরে খতমে কুরআন আয়োজন করা, পশু যবেহ করে কুরআনখানী বা মৃতবার্ষিকীতে অংশ গ্রহণকারীদেরকে খানা খাওয়ানো এবং কবরে টাকা-পয়সা মান্নত হিসেবে পেশ করা জঘন্যতম বিদ্'আত। এসব কাজের সাথে যদি বিশ্বাস করা হয় যে, কবরবাসীরা এগুলোতে খুশি হয়ে আমাদের উপকার করবে, আমাদেরকে ক্ষয়-ক্ষতি এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে এবং যদি বিশ্বাস করা হয় যে, তারা এ হাদিয়া-তোহফা দিলে কবুল করেন তবে তা শুধু বিদ্'আতই নয় বরং বরং শির্ক। নাবী (সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরণের ক্রিয়াকলাপকে লানত করেছেনঃ

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ))

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশম্পাত।" (মুসলিম, অধ্যায়ঃ গাইরুল্লাহর

http://islaminonesite.wordpress.com

উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা হারাম)। মান্নত একটি ইবাদত। আর গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদত করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ "এক ব্যক্তি একটি ছোট মাছির জন্য জান্নাতে গেছে এবং অন্য একজন জাহান্নামে গেছে। সাহাবীগণ কারণ, জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "পূর্ববর্তী উম্মতের দু জন লোক সফরকালে এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে ছিল একটি মূর্তি। মূর্তির সেবকগণ এ দু জন লোককে কোন কিছু মূর্তির উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করতে আদেশ করল। এমনকি হুমকি দিয়ে বলল, "অবশ্যই কিছু না কিছু উৎসর্গ করতে হবে। কমপক্ষে একটি মাছি হলেও মূর্তির উদ্দেশ্যে দিতে হবে। অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।" কোন উপায় না পেয়ে হয়ে দু জনের মধ্যে একজন একটি মাছি ধরে মূর্তির মন্ডপে নিক্ষেপ করল। যার ফলে সে জাহান্নামে স'ন্তান করে নিল। আরেকজন কোন কিছু দিতে অস্বীকার করল। ফলে তাকে হত্যা করা হল এবং সে জান্নাতবাসী হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম)

(১৫) কবরের কাছে বা মাযাবে, পথের ধারে কুরআন পাঠঃ

কবরের কাছে বা মাযার, পথের ধারে বা লোক সমাগম হয় এমন কোন স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করে ভিক্ষা করা বিদ'আত এবং হারাম। আবার দেখা যায় যে, কবরের কাছে

বা মাযারে, পথের ধারে কেউ সূরা ইয়াসীন পড়েন, কেউ পড়েন সূরা তাকাসুর। কেউ সূরা ফাতেহা পড়েন। আবার কেউ তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে বহু বার কবর যিয়ারত করেছেন। তিনি কখনো কোন কবরের কাছে গিয়ে সূরা ফাতেহা, কুরআন থেকে কোন সূরা বা কোন আয়াত পাঠ করেননি। কুরআনের ফযীলত তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইমামদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

এক. না-জায়েয ও বিদআত। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এ মত পোষণ করতেন।

দুই. জায়েয: ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান এ মত পোষণ করতেন।

তিন. শুধু দাফনকালে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এ মত পোষণ করেন এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু ব্যক্তির কবরে খেজুর ডাল গেড়ে দিয়েছিলেন এ জন্য যে খেজুর ডাল যতক্ষন তাজা থাকবে ততক্ষণ জিকির করবে ফলে কবরে আযাব হবে না। যদি খেজুর ডালের জিকিরের কারণে কবর আযাব বন্ধ হয় তাহলে কুরআন তিলাওয়াত করলে কবরের আযাব বন্ধ হবে না কেন? তাই কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা যেতে পারে। কিন্তু তার এ মত অনুমান নির্ভর মাত্র। এর সমর্থনে অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। তবে এ দু কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। মুজতাহিদ ইমামদের মতামত যা-ই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার সাহাবাদের থেকে যা অনুমোদিত নয়, তা শরীয়ত সম্মত বলে স্বীকৃতি পাবে না কখনো। ইমামদের মতামত হল ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদে ভুল করলেও তারা সওয়াব পাবেন আল্লাহর কাছে। কোন কবরের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবাদের কেউ কুরআন থেকে কোন কিছুই পাঠ করেন নি - না সূরা ফাতেহা না সূরা ইখলাস বা সূরা তাকাসুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর

http://islaminonesite.wordpress.com

যিয়ারতকালে কবরবাসীকে সালাম দিয়েছেন ও তাদের জন্য দুআ করেছেন। বহু হাদীসে কীভাবে তিনি সালাম দিয়েছেন ও দুআ করেছেন - তার বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনি কবর যিয়ারত কালে বলতেন -

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. (رواه مسلم ৯৭৩)

হে মুমিন মুসলিম কবরবাসী ! তোমাদের উপর শানি- বর্ষিত হোক। আল্লাহর ই''ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য সুখ ও শানি- প্রার্থনা করছি।

যাই হোক, যেহেতু মহাগ্রন্থ কুরআনকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ তাই এর মাধ্যমে আল্লাহর কালামকে অপমান করা হয়। ইসলাম সাধারণভাবে ভিক্ষাবৃত্তিকেই তো নিন্দা করেছে আবার কুরআনকে মাধ্যম ধরে ভিক্ষা করা?! এটা শুধু হারামই নয় বরং কঠিন গুনাহের কাজ। এভাবে অসংখ্য বিদআত আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুন আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সপ্নিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

(১৬) তথাকথিত পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব উৎকৃষ্ট বিদ'আতঃ নিকৃষ্ট বিদ'আতের সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণটি হল – তথাকথিত পীর ব্যবসা। কারন এদের কিছু কিছু কাজ বিদ'আত তো বটেই সরাসরি শিরক এর পর্যায়ে পরে। যেমন এরা নিজেরাই কিছু সামা সংগীত, গজল, যিকর ইত্যাদি তৈরি করে যার কথাগুলো পুরাপুরি শিরক। আবার এরা মাজারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করে এসবও শিরক। তাসাউফ অর্জন এর নাম করেও এরা দ্বীনের ভেতর নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করেছে। যেমনঃ আম্বিয়া, আউলিয়া, পীর-দরবেশসহ সকল মৃত মুসলমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, তাদের জন্য দুআ করা। এ মাহফিলে জীবিত-মৃত আউলিয়া-বুজুর্গ, পীর-দরবেশ ও তাদের খাদেম ভক্তদের কেরামত বয়ান করা হয়। ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আয়োজক দরবারের দিকে আকৃষ্ট করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহর কাছে এ দরবার ছাড়া আর কোন প্রিয় দরবার যে নেই এটা জোর-জবরদস্তি করে বুঝানো হয় সাধারণ মানুষকে। মীলাদ পড়া হয়। দরবারে অবস্থিত মাদরাসা, মসজিদ ও খানকাহর জন্য চাঁদা তোলা হয়। সর্বশেষে, আখেরি মুনাজাত ও তাবারুকের ব্যবস্থা থাকে। শুধু তাই নয় এরা যে গান বাজনার আসর বসায়,গানের মাহফিলে নর্তন-কুন্দন, নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে যায়, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দুনিয়ার কেউ প্রমান করতে পারবে না রসুলুল্লাহ (সাঃ) বা সাহাবীদের জামানায় এমন কিছু ছিল। অতএব নিসন্দেহে এসব বিদ'আত এবং সম্পূর্ণ বিদ'আতী কাজ। অতএব, ইসলাম শরীয়ত এ কাজ সমর্থন করে না। আল্লাহ আমাদের এসব বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযতে রাখুন, আমীন।

(১৭) ওরসঃ "ওরস" শব্দের আভিধানিক অর্থ "ওলীমা বা বিবাহের খানা, জিয়ারত, বিবাহের দাওয়াত, বাসর যাপন" ইত্যাদি। পারিভাষিক ও রূপক অর্থ "কোন আউলিয়া-ই-কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তকালের দিন ফাতিহা পাঠ উপলক্ষ্যে খাওয়া, ওয়াজ-মাহ্ফিল, মীলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা"।

পূর্ববর্তী যামানায় ওরস শব্দ ব্যবহার করাকে ওলামায়ে হক্কানী-রব্বানীগণ দোষণীয় মনে করেননি। কিন্তু পরবর্তী

http://islaminonesite.wordpress.com

যামানায় ওরসের নাম দিয়ে বেপর্দা, বেহায়াপনা, গান-বাজনা, মেলা ইত্যাদি বেশরীয়তী কাজ করার কারণে পরবর্তী যামানার হক্কানী-রব্বানী আলিমগণ ফতওয়া দিয়েছেন যে, কোন নেক বা দ্বীনী কাজে ওরস শব্দ ব্যবহার করা না করে "ঈসালে সাওয়াব" বা "সাওয়াব রেসানী" শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

(১) পবিত্র কুরআনের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ কুর'আনে বলেন, "বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে পরিচালিত করেছেন, যা বক্রতা হতে মুক্ত দ্বীন, ইবরাহীমের দ্বীন, যিনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহ-অভিমুখী করে রেখেছিলেন। আর তিনি ছিলেন না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আনআম: ১৬১]

(২) হাদীসের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ধর্মে নতুন সৃষ্টি। (এটা বিদআত) আর সব বিদআতই পথভ্রষ্টতা।" [মুসলিম]

http://islaminonesite.wordpress.com

"আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তি করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী ও মুসলিম]

অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই উপমহাদেশের একশ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোঁকায় পরে সরাসরি আল্লাহ'র সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন বুযুর্গের কবরকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। কবর পাকাকরণ নিষিদ্ধ হলেও উনার কবরকে ইট-বালি-সিমেন্টে বাধিঁয়ে মাযারে রূপান্তর করেছে যাকে ঘিরে ইসলামের নামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিদ'আহ-শিরক ও কুফরী কার্যকলাপ যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

গান-বাজনা-মদ-গাঁজার উৎসবে ছেয়ে গেছে মাযারগুলো যা কিনা সুস্পষ্ট হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিয়ো না। (অর্থাৎ কবরের মতো ইবাদত-বন্দেগী শূন্য করো না) এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ো না।" [সুনানে আবু দাউদ]। এছাড়াও রাসূল-সাহাবী-তাবেঈ-তাবেঈন দ্বারা সিদ্ধ নয় এমন

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রচুর কাজই সেখানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ওরস'।

উল্লেখ্য, এভাবে কারোও ইন্তেকালের দিন উদযাপন করা, সেদিন অনেকে একসাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, মীলাদ-ক্বিয়াম করা সুস্পষ্ট বিদ'আহ। কোন সাহাবী-তাবেঈ বা তাবেঈনদের দ্বারা এমন কাজের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং "ওরস" উৎসব হচ্ছে ইসলামের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ 'বিদ'আহ' এবং ইহা পালন করা 'হারাম' এবং কুর'আন ও হাদীস বিরোধী বক্তব্য যা অবশ্যই পরিতাজ্য। আল্লাহ আমাদের সকল বিদআত হতে হেফাযত করুন আমিন।

(১৮) ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতঃ একটি প্রচলিত বিদআতঃ আমাদের সমাজে যতগুলি বিদ’আত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফরয সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত। এই সম্মিলিত মুনাজাতের দলীল নবী (সাঃ) থেকে পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদ’আত বছরে একবার করা হয়, কোন কোনটি হয়ত মাসে একবার, কোন কোনটি হয়তো সপ্তাহে একবার। কিন্তু সম্মিলিত মুনাজাত এমন এক বিদ’আত যা প্রতিদিন পাঁচবাব করা হয়। সুতরাং এর থেকে দুরে থাকতে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীসে বর্ণিত ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দুআ ও যিকিরগুলো এককী পড়তে হবে, দলবদ্ধভাবে নয়। কারণ, হাদীসে এ ক্ষেত্রে পঠিতব্য দুআগুলো প্রায়ই সবই এক বচনের শব্দে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত বর্ষের প্রায় সকল মুসলিম জনগণ (আলিম ও সাধারণ) নবী (সাঃ) কর্তৃক সালাতের পর পঠিতব্য দুআর তালিকাটি আংশিক বা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নিজেরাই বিভিন্ন দুআ নির্বাচন ও সংযুক্ত করেছে। এর সাথে আরো যোগ করেছে দলবদ্ধ ও সম্মিলিত রুপ। ফলে সালাতের পরে দুআর নামে সম্মিলিত মুনাজাতের মাধ্যমে অনেকগুলো সুন্নাত উৎখাত হয়েছে। প্রথমতঃ যে সুন্নাতটি উঠেছে সেটা হল, ফরয সালাতের পর যে নির্দিষ্ট কিছু দুআ ও যিকির রয়েছে এটার জ্ঞানই অধিকাংশ লোকের নেই। যার জন্য ওগুলো কণ্ঠস্থ করার সুযোগ তাদের হয়নি। ঐ সকল দুআ ও যিকির সম্বলিত হাদীসগুলো পড়ার কিম্বা ইমাম সাহেবের মাধ্যমে শোনার অবকাশ হয়নি বা নেই। অতএব সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আর প্রমাণ পেশ করা শরীয়ত বিকৃত করার শামিল। প্রকাশ থাকে যে , কোন কোন 'আলেম ফরয সালাতান্তে হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রমাণে কিছু পুস্তক লিখলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বিতর্কিত নয়। সিদ্ধান্তহীনতার ফলে অথবা স্বার্থান্বেষী হয়ে আমরাই বিষয়টিকে বিতর্কিত

করেছি। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূল (সাঃ), সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ ইমাম-মুক্তাদী মিলে হাত উঠিয়ে কখনো দু'আ করেননি এবং পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় 'আলিমগণ করেননি এবং বর্তমানেও করেন না। কাজেই এটি স্পষ্ট বিদ'আত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক দান করুন – আমীন!!

(১৯) শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করাঃ

"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" -শুনে শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা! একটি বিদ'আতী আমল। কারন উক্ত আমল শরী'আত সম্মত নয়। এর পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণনা এসেছে তা জাল বা মিথ্যা। যেমন-

■ ১ম বর্ণনাঃ খিযির (আঃ) বলেন, মুয়াযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রিয় ব্যক্তিকে স্বাগত, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর কারণে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, অতঃপর তার দুই হাতের বৃদ্ধা আংগুলে চুম্বন করবে ও দুই চোখ মাসাহ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবে না। (তথ্যসূত্রঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল- জার্রাহী, কাশফুল খাফা ২/২০৬ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩৪)

▶তাহক্বীক্বঃ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদই নেই। (তথ্যসূত্রঃ আল- মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২০)[114]

■ ২য় বর্ণনাঃ আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুয়াযযিনের ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলা শুনতেন, তখন তিনি অনুরূপ বলতেন। অতঃপর দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পেটে চুম্বন করতেন এবং দুই চোখ মাসাহ করতেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, আমার বন্ধু যা করল তা যদি কেউ করে, তবে আমার শাফা'আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (তথ্যসূত্রঃ তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩৪)[115]

▶ তাহক্বীক্বঃ এটিও ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই। (তথ্যসূত্রঃ আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীছিল

---

[114] আল- মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২০

[115] তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩৪

http://islaminonesite.wordpress.com

মুশ্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃষ্ঠা নং - ২০)[116]

(১৯) প্রচলিত তাবলীগ এবং চিল্লা প্রথাঃ বর্তমানে মুসলিম সমাজ বিদ‘আতের সর্দিতে ভুগছে। সস্তা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা। তারা খুঁজে ফিরছে সত্যের সন্ধানে। কোথায় পাওয়া যাবে সঠিক পথের দিশা, কোথায় পাওয়া যাবে সত্যিকারের আদর্শ? কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ কোন না কোন আদর্শের সাথে সংযুক্ত। যেমনঃ তাবলীগ জামায়াতের আদর্শ হচ্ছেন মাওলানা ইলিয়াস! পক্ষান্তরে মাযার, খানকা ও তরীকা পূজারী মুরীদদের আদর্শ স্ব স্ব পীর-ফকীর। যার যার নেতা-আমীরদের আদর্শ নিয়ে তারা উৎফুল্ল! তাহলে কোথায় আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শ? ইসলাম কারো মনগড়া ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা নয়। এটা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীন প্রচারিত হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

---

116 আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল- মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীছিল মুশ্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃষ্ঠা নং - ২০

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ أَىَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا.

হুমায়দী (রহঃ) ..... তারিক ইবন শিহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা.)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫:৩) অবতীর্ণ হত, তাহরে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু’আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (রহঃ) মিসআর (রহঃ) থেকে, মিস্আর কায়স থেকে, কায়স (রহঃ) তারিক থেকে শুনেছেন। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ বুখারী :: অধ্যায় :: কুরআন ও

সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন করা অধ্যায়, খন্ড ৯ :: অধ্যায় ৯২ :: হাদিস ৩৭৩)।[117]

সুতরাং রাসূল (সাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, এই দ্বীন তথা ইসলাম পরিপূর্ণ এবং এই দ্বীন তথা ইসলামের মূল দর্শন হল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান। মানব সমাজে আল্লাহর দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে বহুবার দির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।)[118]। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ফেৎনার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং সঠিক দ্বীন প্রচারকের সংখ্যাও যেহেতু খুবই কম, সে কারণে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা এখন 'ফরযে আইন' হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেউ যদি শারঈ ওযর ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে। তাবলীগ মুসলিম মিল্লাতের অতি পরিচিত একটি শব্দ। যার

---

[117] সহিহ বুখারী :: অধ্যায় :: কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন করা অধ্যায় , খন্ড ৯ :: অধ্যায় ৯২ :: হাদিস ৩৭৩

[118] বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থ প্রচার ও প্রসার। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিশ্ব মানবতার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার যে গুরু দায়িত্ব মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে, সেটিকেই তাবলীগ বলে। মূলতঃ রাসূল (সাঃ) বিশ্ব মানুষের কাছে দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছাবার ও প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যেমন আগমন করেছিলেন রাসূল (সাঃ) - এর পূর্বে অগণিত নবী ও রাসূল। রাসূল (সাঃ) - কে তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না (মায়েদা ৬৭) I রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তারপর পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না। তাই বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা, فليبلغ الشاهد الغائب ‘উপস্থিত লোকেরা যেন দ্বীনের এ দাওয়াত অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়’I এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীই তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ‘আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও’I

http://islaminonesite.wordpress.com

মূলতঃ এ কারনেই তাবলীগের অন্যতম জনপ্রিয় একটা গ্রুপ হল তাবলীগ জামায়াত। এই জামায়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এমনকি শুনা যায় যে, বিশ্বের যেখানে সত্যিকারের মুসলিমের প্রবেশ নিষেধ সেখানেও এই জামায়াতের অবাধ বিচরণ। এই জামা'আতের দাওয়াতের মূল উৎস হল ফাযায়েলে 'আমাল বা তাবলীগী নিসাব। এই বইটি আমাদের দেশে খুব পরিচিত। অথচ রাসূল (সাঃ) এর তাবলীগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে এবং দ্বীনের ভিতরে নব উদ্ভাবিত বিদ'আত। কেন বিদ'আত তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রচলন বা আবিষ্কারের কাহিনীঃ

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতিঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের বর্তমান নাম হরিয়ানা এবং সাবেক নাম পাঞ্জাব। ভারতের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানার একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরহাট যেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরীতে এক হানাফী ব্যক্তির জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল আখতার ইলয়াস। কিন্তু পরে তিনি শুধু ইলয়াস নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬

হিজরীতে দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীছ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে বুখারী ও তিরমিযীর দারস গ্রহণ করেন। এর দু'বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারানপুরের মাযা-হিরুল 'উলূমের শিক্ষক হন। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বারে হজ্বে গমন করেন। এই সময় মদীনায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলীগী কাজ শুরু করেন। পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ রজব মোতাবেক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব - এর ভূমিকা পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)[119]

ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগঃ পার্থক্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

---

[119] মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর
উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব - এর ভূমিকা পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

http://islaminonesite.wordpress.com

(ক) তারা নিজেরা কুরআন বুঝে না অন্যদেরকেও বুঝতে দেয় না। কিন্তু রাসূল (সাঃ) নিজে কুরআন শিখিয়েছেন এবং তার প্রচারকও ছিলেন।

(খ) তাদের দাওয়াতী নিয়ম স্বপ্নে প্রাপ্ত। রাসূলের দাওয়াতী নিয়ম স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত (মায়েদা ৬৭)।

(গ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে সপ্তাহে ১ দিন, মাসে ৩ দিন, বছরে ১ চিল্লা, কমপক্ষে জীবনে ৩ চিল্লা লাগিয়ে দ্বীনি কাজ শিখতে হবে। পক্ষান্তরে রাসূলের দাওয়াতী কাজ এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই।

(ঘ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান ও আল্লাহর প্রিয় জিহাদ নেই। কিন্তু রাসূলের দাওয়াতে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ঙ) তাদের দাওয়াতে কাফের মুশরিকদের কোন বাধা নেই। রাসূল (সাঃ) যখন দাওয়াত দিতেন তখন কাফের মুশরিক বাধা দিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

(চ) তাদের দাওয়াতী কাজ শেখার মূল উৎস হল ‘ফাযায়েলে আমাল’। কুরআনের চেয়েও তারা ফাযায়িলে আমাল-এর গুরুত্ব বেশী দেয়। অথচ রাসূলের দাওয়াত শেখার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর কুরআনের মর্যাদা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে।

(ছ) তারা রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না যদিও তারা শিরক করে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলে। রাসূল তৎকালীন রাষ্টপ্রধান ও ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, শিরক ও ইসলাম বিরোধী কাজে বাধা দিয়েছেন।

(জ) তারা কোন দাওয়াতী কাজ করার সময় কুরআন হাদীছের দলীল পেশ করে না, নিজেদের মনগড়া কথা বলে। রাসূল নিজে কোন কিছু বলার বা দাওয়াত দেবার আগে দলীল পেশ করতেন।

(ঝ) তারা কোন মতেই কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। রাসূল যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের দাঁতকে শহীদ করেছেন।

(ঞ) তারা শুধু দাওয়াত কিভাবে দিবে তা শেখায় যদিও তা ইসলামী পদ্ধতিতে নয়; অন্য কোন কিছু তারা শিখায় না। রাসূল জীবনের প্রতি মুহূর্তে কি করতে হবে, কার সাথে কিভাবে চলতে হবে সবকিছু শিখিয়েছেন।

(ট) ইলিয়াসী তাবলীগ বুযুর্গদের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। রাসূলের তাবলীগ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (সূরা আন‘আম ১৬; সূরা বাইয়েনা ৫) ।

(ঠ) ইলিয়াসী তাবলীগের অলিরা গায়েব জানেন। অথচ রাসূল (সাঃ) গায়েব জানতেন না (সূরা আন‘আম ৫০; সূরা আরাফ ১৮৮) ।

(ড) ইলিয়াস ছাহেবের আক্বীদায় রাসূল (সাঃ) জীবিত। কিন্তু নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন (সূরা যুমার ৩০) ।

(ঢ) বুযুর্গরা জান্নাত-জাহান্নাম দুনিয়াতে দেখেন। জান্নাত এমন যে, না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন হৃদয় কল্পনা করেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

(ণ) ইলিয়াসী তাবলীগে বুযুর্গদের মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) - এর তাবলীগের প্রত্যেকের মৃত্যু সত্য (সূরা আল-ইমরান ১৮৫) ।

(ত) পর্যবেক্ষক ফেরেশতারা আল্লাহ ও বান্দার গোপন যিকির সম্পর্কে জানতে পারে না। ফেরেশতাগণ পর্যবেক্ষণ হিসাবে রয়েছেন এবং আমরা যা করি তারা সে সব জানেন (সূরা ইনফিতার ১০ ও ১২) ।

(থ) ইলিয়াসী তাবলীগের কেন্দ্রস্থল ভরতের নিযামুদ্দীন মসজিদের ভিতরে মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব ও তার পুত্রের কবর রয়েছে। নাবী (সাঃ) কবরের দিকে সালাত পড়তে ও কবরকে পাকা নিষেধ করেছেন।

(দ) মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ইন্তিকালের পর আল্লাহর সাথে মিশে গেছেন। নাবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তার সাথে কেউ মিশতে পারে না (সূরা ইখলাস ৪; সূরা শূরা ১১) ।

বিশ্ব বরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামাত ও গ্রন্থসমূহঃ সঊদী আরবের সর্বচ্চ ওলামা পরষিদের সদস্য

আব্দুর রাযযাক আফিফী বলেন, বাস্তবে তাবলীগপন্থিরা বিদ‘আতী, ইসলাম বিকৃতকারী এবং কাদেরীয়া সহ অন্যান্য বাতিল তরীকার অনুসারী।তারা আল্লাহর পথে বের হয়নি বরং তাদের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ইলিয়াসের মনগড়া পথে বের হয়েছে; তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ডাকে না বরং তারা অতি সূক্ষ্মভাবে ইলিয়াসের দিকে ডাকে। আমি অনেক দিন আগে থেকেই এদের চিনি। এরা মিসর, ইসরাঈলে বা আমেরিকায় যে স্থানেই থাকুক না কেন, এরা বিদ‘আতী। (তথ্যসূত্রঃ বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে – তাবলীগ জামাত, মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী, পৃষ্ঠা নং – ৫৮ -৫৯)।[120]

সঊদী অরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য শাইখ সালেহ বিন ফাওযান (রহঃ) বলেন, দাওয়াতের নাম ব্যবহার করে তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যা করে তা বিদ‘আত; সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ অর্থাৎ সালফে সালেহীনরা এভাবে দাওয়াত দেননি। এদের মাঝে অনেক বিদ‘আত এবং ভ্রান্ত কুসংস্কার রয়েছে। এদের কর্মনীতি রাসূল (সাঃ) -এর কর্মসূচী ও কর্মনীতির পরিপন্থী ও বিরোধী। এটি একটি

[120] বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টি তে – তাবলীগ জামাত, মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী, পৃষ্ঠা নং – ৫৮ -৫৯

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ‘আতী ছূফী জামায়াত, এদের সম্পর্কে সাবধান থাকা অপরিহর্য। তারা বিদ‘আতী চিল্লা দেয়। তাদের দ্বারা ইসলামের কোন ফায়দা হবে না এবং কোন মুসলিমের জায়েয হবে না এ জামায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং এদের সাথে চলা। (তথ্যসূত্রঃ তারিখঃ ১৩/৫/১৪১৭ হিজরী, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ সালহ বিন ফাওযান (রহঃ), সঊদী আরব এবং দাওয়াত ও ইলমের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য-শায়েখ ফাওযান।)

তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থ (ফাযায়েল আমল): তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থটি বিদ’আতী উদাহরনে ভুরপুর। যেমনঃ ‘ফাযাযয়লে আমাল’ নামক বইটিতে অধিকংশ আলোচনাই শিরক-বিদআত, মিথ্যা কিচছা-কাহিনী, কুসংস্কার, সূত্রহীন, বানোয়াট জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যেমন, (এক) তাবলীগ জামা‘য়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাযায়েলে তাবলীগ বইটি লেখেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামী মুজাদ্দিদের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং উলামা ও মাশায়েখদের এক চাকচিক্যময় মুক্তার নির্দেশ যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করি। আমার মত গুনাহগারের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের

http://islaminonesite.wordpress.com

সন্তুষ্টিই নাজাতের ওয়াসিলা বইটি পেশ করলাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (আন‘আম ১৬২)। এবার বুঝুন আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইলিয়াস সাহেবের সন্তুষ্টির অর্জন করতে চাইছে।

চিল্লা প্রথাঃ চল্লিশ দিনের জন্য নিজস্ব খরচে তাবলীগে বের হওয়াকে ‘চিল্লা’ বলে।চিল্লা হলো তাবলীগীদের ভিত্তিমূলক রুকন। যে ব্যক্তি চিল্লায় বের হয়, তাকে তারা মহব্বত করে, সম্মান করে ও তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে। আর যারা বিরোধিতা করে তারা তাকে গ্রহণ করে না যদিও সে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব সমূহ পালন করে।প্রচলিত তাবলীগের চিল্লা প্রথাকে শরীয়ত সিদ্ধ প্রমান করার জন্য তারা সূরা আলু ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বর্নীত (أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) এর অপব্যাখ্যা করে এটাকে চিল্লার পক্ষে কুরআনী নির্দেশ বলতে চেয়েছেন যা ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয়।[121] অতএব, এসব বিদ’আতী চিল্লা প্রথা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের আমলকে সমৃদ্ধ

[121] হাদীসের প্রামাণিকতা – মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা নং – ৬৭-৬৮।

করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গঃ ‘ইজতেমা’ শব্দের অর্থ সমাবেত করা, সভা-সমাবেশ বা সম্মেলন। ধর্মীয় কোন কাজের জন্য বহুসংখ্যক মানুষকে একত্র করা, কাজের গুরুত্ব বোঝানো, কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার-প্রসারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় ইজতেমা বলা হয়। তাবলীগ জামা‘আতের বড় সম্মেলন হচ্ছে ‘বিশ্ব ইজতেমা’। ১৯৪৪ সালে প্রথম বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইল সজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। ১৯৬৫ সালে টঙ্গীর পাগার নামক স্থানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুব ছোট পরিসরে। এরই মধ্যে তাবলীগের কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইজতেমায় দেশি-বিদেশী বহু মানুষের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার স্থান নির্ধারণ করা হয়। তখন থেকেই বিশ্ব ইজতেমা সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের পরিণত হয়! ১৯৭২ সালে

সরকার টঙ্গীর ইজতেমাস্থলের জন্য সরকারী জমি প্রদান করেন এবং তখন থেকে বিশ্ব ইজতেমার পরিধি আরো বড় হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার এ জায়গায় ১৬০ একর জমি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন ঘটায়। উক্ত ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ হল এই আখেরী মুনাজাত! মানুষ এখন ফরয ছালাত আদায়ের চাইতে আখেরী মুনাজাতে যোগদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। আখেরী মুনাজাতে শরীক হবার জন্য নামাজী, বে-নামাজী, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী, বিদ‘আতী, দুস্কৃতিকারী দলে দলে ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। কেউ ট্রেনের ছাদে, কেউ বাসের হ্যান্ডেল ধরে, নৌকা, পিকআপ প্রভৃতির মাধ্যমে ইজতেমায় যোগদান করে। তারা মনে করে সকল প্রাপ্তির সেই ময়দান বুঝি টঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়ে। মানুষ পায়খানা-পেসাব পরিষ্কার করেও সেখানে ছওয়াবের আশায় থাকেন। এ যেন সওয়াবের ছড়া ছড়ি, যে যতো কুড়ায়ে থলে ভরতে পারবে তার ততোই লাভ। ট্রেনের ছাদের উপর মানুষের ঢল দেখে টিভিতে সাংবাদিক ভাইবোনগণ মাথায় কাপড় দিয়ে বার বার বলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজ তাদের পাপের প্রাশ্চিত্ত করতে ছুটে চলছেন তুরাগের পাড়ে! পরের দিন বড় হেডিং দেখে যারা এবার যেতে পারেননি তারা মনে মনে ওয়াদা করে বসবেন

যে আগামীতে যেতেই হবে। তা না হলে পাপীদের তালিকায় নাম থেকেই যাবে! এভাবে পঙ্গোপালের মতো এদের বাহিনী বড়তে থাকবে। এদের আর রুখা যাবে না। কেননা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে, বিরোধীদলিয় নেত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণও সেখানে গিয়ে আঁচল পেতে প্রার্থনা করেন। টিভিতে সরাসরি মুনাজাত সম্প্রচার করা হয়। রেডিও শুনে রাস্তার ট্রাফিকগণও হাত তুলে আমিন! আমিন! বলতে থাকে। কি সর্বনাশা বিদ'আত আমাদের কুড়ে কুড়ে গ্রাস করছে তা আমরাও জানি না! আরাফার মাঠে হজ্জ এর সময় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। সেখানে কেন সম্মিলিত মুনাজাত হয় না? যেখানে আল্লাহ নিজে হাযির হতে বলেছেন, যেখানে তিনি অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন। এই প্রশ্নের জবাব যারা বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই বুঝতে পারবে কেন বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত? সম্মিলিত মুনাজাত এর কারণেই বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত। যদি আখেরী মুনাজাত না হত তবে অন্তত বলা যেত ইসলামিক আলোচনার জন্য বিশ্ব ইজতেমা। তাছাড়া এই ইজতেমা বিদ'আতী কিতাব থেকে বয়ান করা হয়। অনেকে আবার এই ইজতেমাকে ২য় হজ্জ বলে উল্লেখ করেন! (নাঊযুবিল্লাহ)। (তথ্যসূত্রঃ তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - আকরাম

http://islaminonesite.wordpress.com

হোসাইন)[122]। এমনকি 'চ্যানেল আই' সহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোতেও এটিকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছে! আল্লাহ তা'আলা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ২য় হজ্জ করতে বলেন নি। এমন কাজ সওয়াবের আশায় করলে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধানের সীমালঙ্ঘন করা হবে। আর আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্ঘন করলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢুকাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি (সূরা নিসা, আয়াত নং - ১৪)।[123]

ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করার লক্ষ্যে যেকোন মাহফিল বা ইজতেমার আয়োজন করা ও সেখানে যোগদান করা যায়। কিন্তু যদি ইসলামের নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীসের এবং ভিত্তিহীন ফাযায়েল ও কেচ্ছা-কাহিনী শোনার দাওয়াত দেয়া হয়, বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল প্রচার করা হয়, তাহলে সেখানে যোগদান করা

122 তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - আকরাম হোসাইন

123 সূরা নিসা, আয়াত নং - ১৪

http://islaminonesite.wordpress.com

যাবেনা। চাই সেটা বিশ্ব ইজতেম হোক বা অন্য কোন ইজতেমা হোক। কারণ বিদ‘আতীদের সঙ্গ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিদ‘আতী লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করতে পারবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম, হা/৪২৪৩।)[124]

অতএব, মুসলিম সমাজে ক্রমশঃ আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে নববীর নির্ধারিত দ্বীনের পরিবর্তে কিছু মনগড়া নবাবিস্কৃত আদর্শ ও নীতি অনুপ্রবেশ করছে। ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাহর পরিবর্তে শিরক বিদ‘আতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তাবলীগপন্থীদের টুপি, পাগরী, লম্বা পোশাকের বাহ্যিক রূপ দেখে অনেকে মনে করেন এরাই সঠিক পথে আছে। বহু মসজিদে তাদেরকে দেখতে পাবেন, ‘বাকি নামাজ বাদ ঈমান ও আমলের কথা হবে আমরা সবাই বসি বহুত ফায়দা হবে’। আসলে প্রকৃতপক্ষেই ঐসব শিরক-বিদ‘আতীদের মজলিসে আপনি বসলে ঈমান ও আমলে ফায়দা তো দূরের কথা বরং ঈমান ও আমল দু’টিই হারাবেন। তাই আল্লাহ তা’আলার কাছে আমাদের ফরিয়াদ হচ্ছেঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে প্রচলিত তাবলীগী

---

[124] মুসলিম, হা/৪২৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ’আতী প্রথা থেকে হেফাযত করুন এবং সঠিক কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে পারি এবং দ্বীনের খেদমত করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

(২০) মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করাঃ সহীহ হাদীসে অনাদায়ী নামাজের জন্য কোন কাফ্ ফারার বিধান নেই। অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির কিছু ওয়াক্ত বা কিছুদিনের জন্য নামাজ কাযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঐ ব্যক্তির পাপ মুক্তির জন্য ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিগণের উপর একটা টাকার পরিমাণ ধরে যা শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক নয় এবং প্রচলিত নিয়ম বিদ’আত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এসব বিদ’আত পরিত্যাজ্য। তাছাড়া শুধু মৃত মানুষের ক্ষেত্রেই নয় জীবিত মানুষের মধ্যেও নামাজের বিষয়ে প্রচুর বিদ’আত পরিলক্ষিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ছুটে যাওয়া কাযা নামায সমূহ প্রথমে আদায় করবে। তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। দেরী করা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত বিদ’আতী প্রথা আছে যে, কারো যদি একাধিক

ফরয নামায ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ঐ নামাযের সময় উপস্থিত হলে তার কাযা আদায় করবে। আজ কারো ফজর নামায ছুটে গেছে। সে উক্ত নামায পরবর্তী দিন ফজরের সময়ে কাযা আদায় করবে। এটা মারাত্মক ভুল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ও কর্মের বিরোধী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"যে ব্যক্তি ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন ইহা আদায় করে যখনই স্মরণ হবে।" এখানে এরূপ বলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন উহা আদায় করে নিবে। খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কয়েকটি নামায ছুটে যায়। তখন তিনি বর্তমান সময়ের নামাযের আগেই উক্ত নামাযগুলোর কাযা আদায় করেন। অতএব ছুটে যাওয়া নামাযের ক্বাযা প্রথমে আদায় করবে তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ ক্বাযা নামাযের আগে বর্তমান

সময়ের নামায আদায় করে ফেলে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এটা তার ওযর।

উল্লেখ্য যে, ক্বাযা নামায সমূহ তিন ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ দেরী করার ওযর দূর হয়ে গেলেই ক্বাযা আদায় করে নিবে। তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে বিতর ও সুন্নাত নামায সমূহ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যার পরিবর্তে অন্য নামায ক্বাযা হিসেবে আদায় করবে। তা হচ্ছে, জুমআর নামায। এ নামায ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করবে। কেউ যদি জুমআর দিন ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর নামাযে শামিল হয়, তবে সে যোহর নামায আদায় করবে। ঐ অবস্থায় যোহরের নিয়ত করে ইমামের সাথে নামাযে শামিল হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইমামের সালামের পর আসে তবে সেও যোহর পড়বে। তবে কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে রুকূ পায়, তবে সে জুমআর নামাযই আদায় করবে। অর্থাৎ ইমাম সালাম

ফিরালে এক রাকাআত আদায় করবে। অনেক লোক ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর জুমআর নামাযে শামিল হয়। অতঃপর সালাম শেষে জুমআর নামায হিসেবে দু'রাকাআত নামায আদায় করে। এটা ভুল। বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যোহর হিসেবে চার রাকাআত নামায আদায় করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ

"যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সালাত পেয়ে গেল।" এদ্বারা বুঝা যায় কেউ যদি এর কম পায় সে নামায পেল না। তখন জুমআর কাযা আদায় করবে যোহর নামায আদায় করার মাধ্যমে। এই কারণে নারীরা বাড়িতে, মসজিদে আসতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তিরা যোহর নামায আদায় করবে। তারা জুমআ আদায় করবে না। তারা যদি জুমআ আদায়ও করে, তাদের নামায প্রত্যাখ্যাত হবে- বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকারঃ এমন নামায যা ছুটে যাওয়া সময়েই কাযা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে ঈদের নামায। ঈদের

দিন সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর জানা গেল যে আজকে ঈদের দিন ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, পরবর্তী দিন সকাল বেলা উক্ত ঈদের নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা ঈদের নামায আদায় করার সময় হচ্ছে সকাল বেলা। [তথ্যসূত্রঃ গ্রন্থের নামঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, বিভাগের নামঃ ঈমান, লেখকের নামঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ), অনুবাদ করেছেনঃ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি - আবদুল্লাহ আল কাফী।][125]

(২০) জামাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা প্রচলিত বিদ'আতঃ

(এক) পেজহরী ও সের্রী কোন সালাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াত ও কিছু হাদীস পেশ করা হয়।

[125] গ্রন্থের নামঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, বিভাগের নামঃ ঈমান, লেখকের নামঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল- উসাইমীন (রহঃ), অনুবাদ করেছেনঃ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি - আবদুল্লাহ আল কাফী।

(ক) আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তোমাদের উপর রহম করা হবে' (আ'রাফ ২০৪)। আরো বলা হয় যে, সালাতে কুরআন পাঠ করার বিরুদ্ধেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

পর্যালোচনাঃ মূলতঃ উক্ত আয়াতে তাদের কোন দলীল নেই। বরং তারা অপব্যাখ্যা করে এর হুকুম লংঘন করে থাকে। কারণ কুরআন পাঠ করার সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হয়েছে। কিন্তু যোহর ও আছরের ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক'আতে ও এশার শেষ দুই রাক'আতে ইমাম কুরআন পাঠ করেন না। অথচ তখনও তারা সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।

দ্বিতীয়তঃ সূরা ফাতিহা উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত আয়াতের আমল বিদ্যমান। কারণ সূরা ফাতিহার পর ইমাম যা-ই তেলাওয়াত করুন মুক্তাদী তার সাথে পাঠ করে না, যদি ইমাম ছোট্ট কোন সূরাও পাঠ করেন। বরং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে থাকে। তাছাড়া উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর। আর তিনিই সূরা

ফাতিহাকে এর হুকুম থেকে পৃথক করেছেন এবং চুপে চুপে পাঠ করতে বলেছেন।. (সহীহ ইবনে হিববান হা/১৮৪১, তাহক্বীক্ব আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ) আর এটা আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে।(নাজম ৩-৪; আবুদাঊদ হা/১৪৫।)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের হুকুম ব্যাপক। সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।(মির‘আতুল মাফাতীহ ৩/১২৫ পৃঃ)। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলাও সূরা ফাতিহাকে কুরআন থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ‘আমি আপনাকে মাছানী থেকে সাতটি আয়াত এবং মহান গ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছি’ (সূরা হিজর ৮৭)।

সুতরাং সূরা ফাতিহা ও কুরআন পৃথক বিষয়। যেমন ভূমিকা মূল গ্রন্থ থেকে পৃথক। এটি কুরআনের ভূমিকা। ভূমিকা যেমন একটি গ্রন্থের অধ্যায় হতে পারে কিন্তু মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা। আর ‘ফাতিহা’ অর্থও ভূমিকা।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব ক্বিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) পরিষ্কারভাবে দাবী করেছেন।(তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০) অনুরূপ ইবনুল মুনযিরও বলেছেন।ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্ব ৪/২২৪ পৃঃ হা/১২৭১-এর আলোচনা দ্রঃ-)

(খ) যোহর ও আছরের ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, ইমামের আগেই যদি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পড়া হয়ে যায়, তাহলে ইমামের অনুসরণ করা হবে না।

তাছাড়া 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' বইয়ে কোন প্রমাণ ছাড়াই জোরপূর্বক লেখা হয়েছে, فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا 'শব্দ দুটি সুস্পষ্টভাবে একথার প্রমাণ করে যে, যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে কিরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদীর কর্তব্য হচ্ছে, সে মনোযোগের সাথে উক্ত কিরাত শ্রবণ করবে। আর [দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ وَأَنْصِتُوْا (নীরব থাকবে) বলার দ্বারা প্রমাণিত হয়], যদি ইমাম নিম্ন আওয়াজেও কিরাত পড়ে তাহলেও মুক্তাগীন (মুক্তাদীগণ) নীরবই থাকবে, কিছুই পড়বে না'।(ঐ, পৃঃ ২৬০-২৬১) ।

পর্যালোচনাঃ সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের আয়াতটির কিভাবে উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয়া হল তা কি লক্ষ্য করেছেন? মনে হল, আয়াতটা লেখকের উপরই নাযিল হয়েছে। তা না হলে এভাবে কেউ ব্যাখ্য দিতে পারেন? যেখানে শর্ত করা হয়েছে, কুরআন যখন তেলাওয়াত করা হবে তখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে। এর মধ্যে কিভাবে যোহর ও আছর ছালাত অন্তর্ভুক্ত হল? মূল কারণ হল, এই অপব্যাখ্যা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন উপায় নেই। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা তো পড়বেই তার সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারে। উক্ত মর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দুই রাক‘আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম। আর পরের দুই রাক‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম। (ইবনু মাজাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ সহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।)

ইমামের অনুসরণের যে দাবী করা হয়েছে, তাও অযৌক্তিক। কারণ রুকূ, সিজদা, তাশাহ্হুদ, দরূদ, দু'আ মাছূরাহ সবই ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে প্রত্যেক সালাতে পড়ে থাকে। সে ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন আসে না যে, ইমাম আগে পড়লেন, না মুক্তাদী আগে পড়লেন। সমস্যা শুধু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে।

আরো দুঃখজনক হল, ফজর, মাগরিব কিংবা এশার সালাতের ক্বিরাআত চলাকালীন একজন মুক্তাদী সালাতে শরীক হয়ে প্রথমে নিয়ত বলে, তারপর জায়নামাযের দু'আ পড়ে অতঃপর তাকবীর দিয়ে ছানা পড়ে থাকে। অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। তাহলে সূরা ফাতিহা কী অপরাধ করল? ক্বিরাআত অবস্থায় যদি সূরা ফাতিহা না পড়া যায় তাহলে উদ্ভট নিয়ত, জায়নামাযের ভিত্তিহীন দু'আ ও ছানা পড়ার দলীল কোথায় পাওয়া গেল?

অতএব যারা কোন ছালাতেই, কোন রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয মনে করে না, তাদের জন্য উক্ত

আয়াতে কোন দলীল নেই। তাদের দাবী কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট, মনগড়া ও অযৌক্তিক।

(২১) জোরে আমীন না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আতঃ প্রচলিত মাযহাব যেহেতু বিদ'আত। তাই প্রচলিত মাযহাবে আমিন জোরে বলা যাবে না। শুধু তাই নয়, সহীহ হাদীস সংকলন গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট প্রমান আছে যে, সালাতে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর জোরে 'আমীন' বলবেন এবং মুক্তাদীগনও সশব্দে 'আমীন' বলবেন। কেননা রাসূল (সাঃ) এর জামানায় জামাতে সালাত আদায় করার সময় 'আমীন' বলার সাথে সাথে মসজিদ কেঁপে উঠত এবং এর স্পষ্ট সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে অসংখ্য দলীল আছে। তারপরেও আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে বিদ'আতী তরীকায় আমীন জোরে বলার কোন প্রবনতা পরিলক্ষত হয় না। তাই স্পষ্টত্ই প্রমানিত হয় যে, জোরে 'আমীন' না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আত। কেন সালাত জোরে 'আমীন' বলতে হবে তার সহীহ হাদীসগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

০১। আতা (রহঃ) বলেন, আমীন হল দু'আ। তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ও তার পিছনের মুসল্লীগণ এমনভাবে আমীন বলতেন যে মসজিদে গুমগুম

http://islaminonesite.wordpress.com

আওয়াজ হতো। আবু হুরায়রা (রাঃ) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে আমীন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি (রাঃ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) কখনই আমীন বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য)উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, অনুচ্ছেদ - ৫০২, পৃষ্ঠা নং ১২০ও১২১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

০২। حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " آمِينَ " .

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রঃ)—- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা, যার আমীন (বলা) ফিরিশতাদের আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (সহীহ বুখারী,২য় খন্ড, হাদিছ নং ৭৪৪, পৃষ্ঠা নং ১২১ প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

০৩। আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) —- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিশ্তাগণ আমীন বলেন এবং উভয়ের আমীন একই সময়ে হলে তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, হাদিছ নং ৭৪৫, পৃষ্ঠা নং ১২১ প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৭৪৬ নং হাদিস।)

০৪। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে, ব্যক্তি ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে। তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড,হাদিস নং ৭৯৮, পৃষ্ঠা নং ১৬০ও ১৬১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

০৫। কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) —- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, ইমাম যখন গাইরিল মাগ—- ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলবেন, তার পিছনের ব্যক্তি মুক্তাদি আমীন বলবে এবং তার বাক্য আকাশবাসীর (ফিরিশতা) বাক্যের অনুরূপ একই সময়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

উচ্চারিত হবে,তখন তার পূর্ববর্তী সমূদয় পাপ মোচন হয়ে যাবে। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৮০৩, পৃষ্ঠা নং ১৬২, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৭৯৯ - ৮০২ নং হাদিস)।

০৬। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও তখন আমীন বলো। কেননা, যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাতে মিলে যাবে,তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব (রঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৮১০, পৃষ্ঠা নং ১৭৮, প্রকাশনী- ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৮১১-৮১৫ নং হাদিস)।

০৭। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ { وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

মুহাম্মদ ইবনু কাছীর (রঃ) —ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পাঠ করার পর জোরে ‘আমীন

বলতেন’। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯৩২, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

০৮। حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ .

মাখলাদ ইবনু খালিদ (রঃ) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করা কালে তিনি উচ্চস্বরে আমীন বলেন এবং (সালাত শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরান এভাবে যে, – আমি তাঁর গন্ডদেষের সাদা অংশ পরিষ্কারভাবে দেখি। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৩, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

০৯। حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلاَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ .

http://islaminonesite.wordpress.com

নাসর ইবনু আলী (রঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর চাচাত ভাই আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠের পরে এমন জোরে আমীন বলতেন যে প্রথম কাতারে তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা তা শুনতে পেত। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯৩৪, পৃষ্ঠা নং ৩৭, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১০। حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا " آمِينَ " . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

আল কানাবী (রঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফিরিশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলবে,তার পূর্ব জীবনের সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে। ইবনু শিহাব (রঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯৩৬, পৃষ্ঠা নং ৩৮, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীন এর সাথে একত্রে উচ্চারিত হয় তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়। (তথ্যসূত্রঃ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১২। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বল। যাহার বাক্য ফিরিশতাদের (আমীন) বাক্যের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে। (তথ্যসূত্রঃ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, রেওয়াত নং - ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৩। আমর ইবনু উসমান (রঃ)—আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তিলাওয়াতকারী আমীন বলে , তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগনও আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত হবে,আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

(তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯২৮, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৪। মুহাম্মদ ইবনু মানসুর(রঃ)—আবু হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,যখন তিলাওয়াতকারী (ইমাম) আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগনও আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত হবে,আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯২৯, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৫। ইসমাইল ইবনু মাসুদ (রঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম ‘গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। ইমামও আমীন বলে থাকেন, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত হবে, আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (সুনানু ইবনু নাসাই,২য় খণ্ড,হাদিস নং ৯৩০, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৬। আবু বকর ইবনু আবু শায়বা ও হিসাম ইবনু আম্মার (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ক্বারী (ইমাম) আমীন বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। আর যার আমীন বলা, ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সুনানু ইবনু মাজাহ,১ম খণ্ড,হাদিস নং ৮৫১, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৭। বকর ইবনু খালফ ও জামীল ইবনু হাসান ও আহমদ ইবনু আমর ইবনু সারাহ মিসরী ও হাশিম ইবনু কাশিম হাররানী —আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেনঃ যখন ইমাম আমীন বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার আমীন ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৮৫২, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৮। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا قَالَ " {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} "

حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا . " . قَالَ " آمِينَ الْمَسْجِدُ .

মুহাম্মদ ইবনু বাশশার (রঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন গাইরিল—ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলতেন; তখন তিনি বলতেন আমীন। এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত এবং এতে মসজিদ গুঞ্জরিত হত। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৮৫৩, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

১৯। حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله

ইসহাক ইবনু মানসুর (রঃ) — আয়েশা (রাঃ) এর সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। ইয়াহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত ঈর্ষান্বিত হয় না, যতটা না তারা তোমাদের সালাত ও আমীনের উপর ঈর্ষান্বিত হয়। (সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৮৫৬, পৃষ্ঠা নং ৩২৭, প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)।

২০। حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ

صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ " .

ইবনু 'আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহূদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশি ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো।

২১। حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পুর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭৮০-৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; মুসলিম ৪১০/১-৪, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫-৩০, আবূ দাঊদ ৯৩৫-৩৬, আহমাদ ৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৫-৯৭, দারিমী ১২৪৫-৪৬, মাজাহ ৮৫২, ৮৫৩।

তাহক্বীক্ব আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াহ ৩৪৪, সহীহ আবী দাউদ ৮৬৬। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদিস ৮৫১। আবওয়াবু আকামাতিস-স্বলাত ওয়াস-সুন্নাত ফীহা অধ্যায়)।

(২২) হজ্জের বিদ'আতসমূহঃ হজ্জ [আরবী: (حج) হাজ্জ্ব] ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত। এটি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্ব সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক। [তথ্যসূত্রঃ Dalia Salah-El-Deen, Significance of Pilgrimage (Hajj)] আরবী জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজ্বের জন্য নির্ধরিত সময়। হজ্জ পালনের জন্য বর্তমান সৌদী আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

অবস্থান আবশ্যক। (তথ্যসূত্রঃ Atlas of Holy Places, p. 29)। যিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য গমন করেন তাঁকে বলা হয় হাজী। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُما- قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ:((بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاَةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ الله الحرام، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

এই হাদীসে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের আলোচনা করা হয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ মুসলিম :: খন্ড ১ :: হাদিস ১)।

হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভেও সর্বশেষ তথা পঞ্চম স্তম্ভ। এটি দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগের সমন্বেয় বিরাট ফযীলত পূর্ণ ইবাদত এবং হজ্জ নবম হিজ্জরীতে ফজর হয়। মক্কা যাতায়াত ও হজ্জ পালন কালে অবস্থানের খরচের অর্থ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি সমপরিমাণ অর্থের যে কোন মালিকের উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরজ।

১। কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (آل عمران : ٩٧)

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থ: আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, যারা সেখানে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করবে, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ সমগ্র জগৎ থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত নং - ৯৭)। অতএব, ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদীস অনুযায়ী হজ্জকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে। তাই হজ্জের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ :

যে হজ্জ করল ও শরীয়ত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট 'হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল। অর্থাৎ বৎসরের নির্ধারিত সময়ে হেরেম শরীফ যিয়ারত ও আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা পালনই হচ্ছে হজ্জ। অথচ এই হজ্জব্রত পালনের মধ্যেও আমাদের মাঝে প্রচলন করে দেয়া হয়েছে অসংখ্য বিদ'আত এবং যা হজ্জের ইবাদতের সাথে এর তথা

http://islaminonesite.wordpress.com

শরীয়তের কোন ভিত্তি নেই বললেই চলে। নিম্নে তাঁর কতিপয় বিদ'আত সমূহের বিবরন আলোচনা হলোঃ-

(১) হজ্জের নিয়তঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ".

হুমায়দী (রহ) .... ‘আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্(সাঃ)কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদিস ১)।

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নিয়ত অর্থ - মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমেই নিয়ত করতে হবে। মুখে প্রকাশ করলে তা বিদ‘আতে পরিণত হবে। অতএব, হজ্জ সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে ‘লাববাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান’ অথবা ‘লাববাইক আল্লাহুম্মা ওমরাতান’ বলে হজ্জ অথবা ওমরায় প্রবেশ করবে। সালাত আদায়ের জন্য যেমন ‘নাওয়াইতু আন উছল্লি...’ পড়া বিদ‘আত, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তেমনি ‘নাওয়াইতু আন আহুজ্জা ...’ পড়াও বিদ‘আত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

(২) দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করাঃ বর্তমানে দলবদ্ধভাবে হজ্জের তালবিয়া পাঠের প্রচলন অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় কেউ কখনো দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। সকলেই নিজ নিজ গতিতে তালবিয়া পাঠ করতেন। (তথ্যসূত্রঃ মুস্তাদরাক হাকেম হা/৯১৪; সহীহুল জামে‘ হা/৬৮৩০।)

(৩) তাওয়াফের মধ্যে দলবদ্ধভাবে দো'আ করাঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত'। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলোঃ-

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ { قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } "

Narrated An-Nu'man ibn Bashir: The Prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) said: Supplication (du'a') is itself the worship. (He then recited :) "And your Lord said: Call on Me, I will answer you" (তথ্যসূত্রঃ আবুদাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; মিশকাত হা/২২৩০; সনদ সহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৭।) [সুনান আবু দাউদ :: বিতর সম্পর্কীয় অধ্যায় ৮, হাদিস ১৪৭৯)।

(৪) মহিলাদের ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলাঃ মহিলাদের অনেককেই দেখা যায় ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলেন বা দৌড়ান। অথচ এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য খাছ, নারীদের জন্য নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

‘নারীদের জন্য তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে রমল তথা দ্রুত চলতে হবে না’। (তথ্যসূত্রঃ দারাকুত্বনী হা/২৭৯৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৩১১০।)

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বলা যায় যে, ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ’ল, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া। তিনি যে পদ্ধতিতে দো‘আ করেছেন ঠিক সে পদ্ধতিতেই আমাদের দো‘আ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কেউ কখনো তাওয়াফ ও সাঈতে দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে দো‘আ করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ বিদ‘আতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সুন্নাতী পদ্ধতিতে দো‘আ করা অপরিহার্য। আর তা হ’ল, নিম্নস্বরে বিনম্রচিত্তে একাকী দো‘আ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

‘তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি যালিমদেরকে পসন্দ করেন না’ (সূরা আ‘রাফ, ৭/৫৫)। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ-

‘তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনম্রচিত্তে ও গোপনে অনুচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না’ (সূরা আ‘রাফ ৭/২০৫)।

(৫) অন্যান্য হজ্জ্ব সম্পৃক্ত বিদ’আতসমূহঃ অন্যান্য হজ্জ্ব সম্পৃক্ত বিদ’আত সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ-

১। ঢাকার হাজী কাম্পে ইহরাম বেঁধে দুই রাকআত সলাত আদায় করে তালবিয়া পাঠ করা

২। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

৩। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা

৪। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

৫। মক্কা থাকাকালীন সময়ে আয়েশা মসজিদে গিয়ে ২ বার উমরা করা

http://islaminonesite.wordpress.com

৬। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার সময় সলাত জমা করে না পড়া

৭। মদিনায় গিয়ে হানাফি মাজহাবে প্রচলিত ৪০ ওয়াক্ত সলাত জামাতে পড়া

৮। সওয়াব লাভের আশায় রিয়াজুল জান্নাতে গিয়ে অধিক সময় ধরে সলাত পড়া

৯। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সামনে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পড়া

১০। বাকি কবরস্থানে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পাঠ করা

১১। মক্কা ফেরার পথে মসজিদে নববী থেকে ইহরাম বাঁধা

১২। হজের জন্য ইহরাম বেঁধে ফজরের আগে রাতের বেলা মিনাতে যাওয়া

১৩। আরাফাত ময়দানে ফজরের আগে রাতের বেলা পৌছানো

১৪। মিনা ও আরাফাতে সলাত কসর ও জমা করে না পড়া

১৫। মুজদালিফা থেকে পাথর কুড়ান

১৬। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৭। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা

১৮। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৯। মক্কাতে আসার পর টাক হওয়া

২০। বিদআতি পদ্ধতিতে সলাত আদায় করা। এছাড়াও আরও অসংখ্য বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আরও অসংখ্য বিদ'আত রয়েছে যা উপরে কম বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, মৌলভী নামের আলেম সমাজের নিজস্ব পদ্ধতিতে বানানো এসব দোআ – দরূদ, কেচ্ছা – কাহিনী হজ্জকে শুধু নষ্টই করবে না বরং বিদ'আত অনুসরনের জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

সুতরাং, হজ্ব করতে যাওয়ার আগে প্রতিটি মুসল্লীর উচিত হবে নাবী করিম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা কিভাবে হজ্ব পালন করেছেন তা সঠিক ভাবে একজন হক্বপন্থী আলেম থেকে জেনে নেয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই বললেই চলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(২২) অন্যান্য বিদ'আতী কাজ এবং সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার সমূহঃ নির্দিষ্ট কোন দিনে কবর যিয়ারতের জন্য একত্রিত হওয়া, হাফেজদের দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি। ঈদ বা জুমার দিন পুরুষ-মহিলা একসাথে বা আলাদা আলাদাভাবে কবরের পাশে একত্রিত হওয়া, খানা বিতরণ অথবা কিছু তথাকথিত মৌলোভী বা কুরআনের হাফেজদেরকে একত্রিত করে কুরআন পড়িয়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি কাজ সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং নাজায়েয। কবর যিয়ারতের জন্য জুমা বা ঈদের দিনের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট প্রামাণিত নয়। অনুরূপভাবে কাবরের পাশে কুরআন পড়া বা পড়ানো একাটি ভিত্তিহীন কাজ। একে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা আরও বেশি অন্যায়। শুধু তাই নয়, প্রচলিত সালাতেও অসংখ্য বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া আমাদের সমাজে

http://islaminonesite.wordpress.com

অনেক বিদ'আতীয় প্রচলিত কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১) পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া যাবে না। তাহলে পরীক্ষায় ডিম (গোল্লা) পাবে।

২) খাবার সময় সালাম দিতে নেই।

৩) দোকানের প্রথম কাস্টমর ফেরত দিতে নাই।

৪) নতুন স্ত্রীকে নরম স্থানে বসতে দিলে মেজাজ নরম থাকবে।

৫) বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ দিতে হবে।

৬) ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ বললে' রোগ বেড়ে যাবে।

৭) জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান জন্ম নিবে।

৮) রাতে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে নাই।

৯) চোখে কোন গোটা হলে ছোট বাচ্চাদের গোপনাঙ্গে লাগালে সুস্থ হয়ে যাবে।

১০) ভাই-বোন মিলে মুরগী জবেহ করা যাবে না।

১১) ঘরের ময়লা পানি রাতে বাইরে ফেলা যাবে না।

১২) ঘর থেকে কোন উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর পেছন থেকে ডাক দিলে যাত্রা অশুভ হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৩) ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবে।

১৪) কুরআন মাজীদ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল দিতে হবে।

১৫) ছোট বাচ্চাদের দাঁত পড়লে ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলতে বলা হয়, দাঁত ফেলার সময় বলতে শিখানো হয়, “ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, তোর চিকন দাঁত টা দে, আমার মোটা দাঁত টা নে।”

১৬) মুরগীর মাথা খেলে মা-বাবার মৃত্যু দেখবে না।

১৭) বলা হয়, কেউ ঘর থেকে বের হলে পিছন দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ। তাতে নাকি যাত্রা ভঙ্গ হয় বা অশুভ হয়।

১৮) ঘরের ভিতরে প্রবেশ কৃত রোদে অর্ধেক শরীর রেখে বসা যাবে না। (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে আর কিছু অংশ বাহিরে) তাহলে জ্বর হবে।

১৯) রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।

২০) রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া যাবে না।

২১) ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হবে।

২২) ঘরের চৌকাঠে বসা যাবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com

২৩) মহিলাদের মাসিক অবস্থায় সবুজ কাপড় পরিধান করতে হবে। তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না।

২৪) বিধবা নারীকে সাদা কাপড় পরিধান করতে হবে।

২৫) ভাঙ্গা আয়না দিয়ে চেহারা দেখা যাবে না। তাতে চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে।

২৬) ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসবে। আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসবে।

২৭) নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুনে ছেক দিয়ে পড়তে হবে।

২৮) নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই।

২৯) বৃষ্টির সময় রোদ দেখা দিলে বলা হয় শিয়ালের বিয়ে।

৩০) আশ্বিন মাসে নারী বিধবা হলে আর কোন দিন বিবাহ হবে না।

৩১) খানার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয়, তবে বলা হয় খানা না কি কুকুরের পেটে চলে যায়।

৩২) রাতের বেলা কাউকে সুই-সূতা দিতে নাই।

৩৩) গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতে নাই।

৩৪) খালি ঘরে সন্ধ্যার সময় বাতি দিতে হয়। না হলে ঘরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বিপদ আসে।

৩৫) গোছলের পর শরীরে তেল মাখার পূর্বে কোন কিছু খেতে নেই।

৩৬) মহিলার পেটে বাচ্চা থাকলে কিছু কাটা-কাটি বা জবেহ করা যাবে না।

৩৭) পাতিলের মধ্যে খানা থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড় হয়ে যাবে।

৩৮) কোন ব্যক্তি বাড়ি হতে বাহির হলে যদি তার সামনে খালি কলস পড়ে যায় বা কেউ খালি কলস নিয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে যাত্রা বন্ধ করে দেয়, বলে আমার যাত্রা আজ শুভ হবে না।

৩৯) ছোট বাচ্চাদের হাতে লোহা পরিধান করাতে হবে।

৪০) রুমাল, ছাতা, হাত ঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার স্বরূপ দেয়া যাবে না।

৪১) হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে।

৪২) হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে।

৪৩) নতুন স্ত্রী কোন ভাল কাজ করলে শুভ লক্ষণ।

৪৪) পাখি ডাকলে বলা হয় ইষ্টি কুটুম (আত্মীয়) আসবে।

৪৫) কাচা মরিচ হাতে দিতে নাই।

৪৬) তিন রাস্তার মোড়ে বসতে নাই।

৪৭) খানার সময় যদি কারো ঢেকুর আসে বা মাথার তালুতে উঠে যায়, তখন একজন আরেকজনকে বলে, দোস্ত তোকে যেন কেউ স্মরণ করছে বা বলা হয় তোকে গালি দিচ্ছে।

৪৮) কাক ডাকলে বিপদ আসবে।

৪৯) শুঁকুন ডাকলে মানুষ মারা যাবে।

৫০) পেঁচা ডাকলে বিপদ আসবে।

৫১) তিনজন একই সাথে চলা যাবে না।

৫২) দুজনে ঘরে বসে কোথাও কথা বলতে লাগলে হঠাৎ টিকটিকির আওয়াজ শুনা যায়, তখন একজন অন্যজনকে বলে উঠে "দোস্ত তোর কথা সত্য, কারণ দেখছস না, টিকটিকি ঠিক ঠিক বলেছে।"

৫৩) একজন অন্য জনের মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয় বার টোকা দিতে হবে, একবার টোকা খাওয়া যাবে না। নতুবা মাথায় ব্যথা হবে/শিং উঠবে।

৫৪) ভাত প্লেটে নেওয়ার সময় একবার নিতে নাই।

৫৫) নতুন জামাই বাজার না করা পর্যন্ত একই খানা

http://islaminonesite.wordpress.com

খাওয়াতে হবে।

৫৬) নতুন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে আড়াই দিন অবস্থান করতে হবে।

৫৭) পাতিলের মধ্যে খানা খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে।

৫৮) পোড়া খানা খেলে সাতার শিখবে।

৫৯) পিপড়া বা জল পোকা খেলে সাতার শিখবে।

৬০) দাঁত উঠতে বিলম্ব হলে সাত ঘরের চাউল উঠিয়ে তা পাক করে কাককে খাওয়াতে হবে এবং নিজেকেও খেতে হবে।

৬১) সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ঘর ঝাড়– দেয়ার পূর্বে কাউকে কোন কিছু দেয়া যাবে না।

৬২) রাতের বেলা কোন কিছু লেন-দেন করা যাবে না।

৬৩) সকাল বেলা দোকান খুলে যাত্রা (নগদ বিক্রি) না করে কাউকে বাকী দেয়া যাবে না। তাহলে সারা দিন বাকীই যাবে।

৬৪) দাঁড়ী-পাল্লা, মাপার জিনিস পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে সালাম করতে হবে, না হলে লক্ষ্মী চলে যাবে।

৬৫) শুকরের নাম মুখে নিলে ৪০দিন মুখ নাপাক থাকে।

৬৬) রাতের বেলা কাউকে চুন ধার দিলে চুন না বলে ধই বলতে হয়।

৬৭) বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তাহলে যাত্রা অশুভ হবে।

৬৮) কোন ফসলের জমিতে বা ফল গাছে যাতে নযর না লাগে সে জন্য মাটির পাতিল সাদা-কালো রং করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

৬৯) বিনা ওযুতে বড় পীর (!!) আবদুল কাদের জিলানীর নাম নিলে আড়াইটা পশম পড়ে যাবে।

৭০) নখ চুল কেটে মাটিতে দাফন করতে হবে, কেননা বলা হয় কিয়ামতের দিন এগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

৭১) নতুন স্ত্রীকে দুলা ভাই কোলে করে ঘরে আনতে হবে।

৭২) মহিলাগণ হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হবে।

৭৩) স্ত্রীগণ তাদের নাকে নাক ফুল না রাখলে স্বামীর বেঁচে না থাকার প্রমাণ।

৭৪) দা, কাচি বা ছুরি ডিঙ্গিয়ে গেলে হাত-পা কেটে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

৭৫) গলায় কাটা বিঁধলে বিড়ালের পা ধরে মাপ চাইতে হবে।

৭৬) বেঁচা কেনার সময় জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না। যেমন, এক লক্ষ টাকা হলে তদস্থলে এক লক্ষ এক টাকা দিতে হবে। যেমন, দেন মোহর (কাবীন) এর সময় করে থাকে, একলক্ষ এক টাকা ধার্য করা হয়।

৭৭) বন্ধু মহলে কয়েকজন বসে গল্প-গুজব করছে, তখন তাদের মধ্যে অনুপস্থিত কাউকে নিয়ে কথা চলছে, এমতাবস্থায় সে উপস্থিত হলে, কেউ কেউ বলে উঠে "দোস্ত তোর হায়াত আছে।" কারণ একটু আগেই তোর কথা বলছিলাম।

৭৮) হঠাৎ বাম চোখ কাঁপলে দুঃখ আসে।

৭৯) বাড়ী থেকে কোথাও জাওয়ার উদ্দেশে বেড় হলে সে সময় বাড়ির কেউ পেছন থেকে ডাকলে অমঙল হয়।

৮০) স্বামীর নাম বলা জাবে না এতে অমঙ্গল হয়।

৮১) বাছুর এর গলায় জুতার টুকরা ঝুলালে কারো কু দৃষ্টি থেকে বাচা যায়। (তথ্যসূত্রঃ সংকলনেঃ জাহিদুল ইসলাম - সম্পাদনায়ঃ আব্দুল্লাহিল হাদী)।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, এভাবে অসংখ্য বিদআত ও প্রচলিত কুসংস্কার আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুন আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সঙ্কিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (ﷺ) ও তার হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করা। আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ পরিহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ . فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "

আহমদ ইবন হাম্বল (رحيمه الله) ... হাজার ইবন হাজার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা ইরবায ইবন সারিয়া (رضي الله عنه) - এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না। রাবী বলেনঃ আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি, “আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার খিদমতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য

http://islaminonesite.wordpress.com

এসেছি।” তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) আমাদের সঙ্গে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়। আমাদের মধ্যে একজন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অছীয়ত করুন। তখন তিনি (صلى الله عليه وسلم) বলেন, আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। [তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদিস ৪৬০৭][126]

---

[126] সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যতটুকু ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ততটুকুই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়। কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যত ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয় এবং বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। অথচ আজ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে তথা বাংলাদেশ মুসলিম দেশসহ সকল মানব জাতি বিভিন্নভাবে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় ব্যস্ত। কেউ মূর্তি পূজার মাধ্যমে, কেউ কবর পূজার মাধ্যমে, কেউ পীর পূজার মাধ্যমে, আবার কেউবা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলে সচেষ্ট। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর নাযিলকৃত বিধানের যথাযথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ প্রত্যেকটি ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সম্পাদন করবে। আর এর মাধ্যমেই কেবল তাঁর নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানু তা'আলা তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

http://islaminonesite.wordpress.com

'হে নবী! আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত' (আহযাব ৩৩/১-২)[127]। তিনি অন্যত্র বলেনঃ

اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

'তুমি তার অনুসরণ কর, যা তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক' (আন'আম ৬/১০৬)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

'অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং

[127] সূরা আহযাব, আয়াত – ১-২

http://islaminonesite.wordpress.com

যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না’ (সূরা জাসিয়া ৪৫/১৮)।[128]

অতএব একমাত্র অহি-র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। অহি-র বিধান বহির্ভূত আমল করলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হ’তে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ

‘এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ’তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ (সূরা আন‘আম ৬/১৫৩)[129]।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা’আলা যেমনভাবে তাঁর সরল-সঠিক পথ তথা সুন্নাতের পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাকে ধ্বংসকারী পথ তথা বিদ‘আতের পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

[128] সূরা জাসিয়া ৪৫/১৮

[129] সূরা আনআম, আয়াত নং - ১৫৩

http://islaminonesite.wordpress.com

'যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' (সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৬)[130]।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

'আল্লাহর ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছ' (সূরা নাহল ১৬/৩৬)[131]।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

'যারা ত্বাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও' (সূরা যুমার ৩৯/১৭)[132]।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

---

[130] সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৬

[131] সূরা নহল ১৬/৩৬

[132] সূরা যুমার, ৩৯/১৭

http://islaminonesite.wordpress.com

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

‘যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ (মুসলমানদের জন্য) হারাম এবং তার প্রতিদান আল্লাহর নিকটে রয়েছে। অতএব, মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে তার বাস্তব রূপ মুহাম্মাদ (সাঃ) দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ওয়াজিব। সাথে সাথে তাঁর সুন্নাতকে ধ্বংসকারী বিদ’আত সম্পর্কে জানাও ওয়াজিব। প্রসিদ্ধ তাবে-তাঁবেই সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) [১৬১ হিঃ] বলেন, “ইবলিসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ’আত বেশি প্রিয়। কারন গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিদ’আতে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে না”।

সুতরাং, যারা বিদ’আত এর অপসারণ করে সুন্নতকে ফিরিয়ে আনবে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে - “বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে”। (তিরমিজি, কিতাবুল ঈমান, ২৬৩০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাঁদের যারা নবীজীর হারিয়ে যাওয়া সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানা ওয়াজিব।

কেননা বিদ'আত সম্পর্কে জানা না থাকলে সে কখন কিভাবে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তা উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং, সঠিকভাবে জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে পারি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিদাতীর পরিচয়, বিদ'আত চেনার উপায় এবং বিদাতীর কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি এবং বিদ'আতের ভয়াবহতাঃ

সাধারন ভাবে সুন্নতের বিপীরত বিষয়কে বিদাত বলে। আর শার'ঈ ভাবে বিদআত হলো "আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন কোন প্রথা বা ইবাদতের প্রচলন করা যা শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয় (তথ্যসূত্রঃ আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা)[১৪১]

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ‘আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিঃআর এ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম হল এ কথা বলা যে, মানুষ নতুন করে কোনো কিছু তখনই উদ্ভাবন করে, যখন তারা সেটাকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করে, কেননা তারা যদি বিশ্বাস করত যে, তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিছু আছে, তাহলে তারা তা উদ্ভাবন করত না; সুতরাং যখন মানুষ কোনো কিছুকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করবে, তখনি সেটার কারণের প্রতিও নজর দিতে হবে; অতঃপর যদি কারণটি এমন বিষয় হয়, যার উদ্ভব হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে, তাহলে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- দলিল-প্রমাণ গ্রন্থবদ্ধ করা; কেননা, এর প্রয়োজনীয় কারণ হল ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ; সুতরাং তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন তার প্রয়োজন হয়নি। আর যদি এই ধরনের কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এমন অস্থায়ী কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়, যা তাঁর মৃত্যুর কারণে দূর হয়ে গেছে, তাহলে অনুরূপভাবে তা উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- কুরআন সংকলন করা; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই কাজের প্রতিবন্ধকতা ছিল ওহী অবতীর্ণ অব্যাহত থাকা, কেননা

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করতেন; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে।[133]

বিদাতীর কাজের পরিণতি ৩টি, যথাঃ

(১) ঐ বিদ'আতী কাজ বা আমল আল্লাহর দরবারে কখনোই গৃহীত হবে না।

(২) বিদ'আতী কাজ বা আমলের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহী বিস্তার লাভ করে এবং

(৩) এ গোমরাহীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিদ'আত কার্য সম্পাদনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী ও মুসলিম)[134]

রাসূল (صلى الله عليه وسلم) আরও বলেছেন, আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে সাবধান থেকো! নিশ্চয়ই

---

[133] [তথ্যসূত্রঃ সংকলন: শাইখ আহমদ আর- রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]।

[134] বুখারী ও মুসলিম

প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ'আত। আর প্রত্যেকটি বিদআত গোমরাহীর পথে পরিচালিত করে আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম। (তথ্যসূত্রঃ আহমদ, আবু দাউদ, আত্ তিরমিযী)[135]

বিদ'আতের ভয়াবহতাঃ বিদ'আতের ভয়াবহতার কারণ হল, অপরাধী ব্যক্তি জানে যে, সে অপরাধের সাথে জড়িত, ফলে তার পক্ষ থেকে আশা করা যায় যে সে তা থেকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু বিদ'আতের অনুসারী বিশ্বাস করে যে, সে আনুগত্য ও ইবাদতের মধ্যেই আছে, ফলে সে তাওবা করে না এবং ক্ষমাও প্রার্থনা করে না। আর এটাই ইবলিস থেকে বর্ণনা করা হয় যে, সে বলে: "আমি আদম সন্তানদের পিঠ ভেঙ্গে দেই অপরাধ ও পাপরাশি দ্বারা, আরা তারা আমার পিঠ ভেঙ্গে দেয় তাওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) দ্বারা; তাই আমি তাদের জন্য এমন কতগুলো অপরাধের প্রবর্তন করি যার থেকে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না এবং তার থেকে তারা তাওবাও করে না আর সেগুলো হল ইবাদতের আকৃতিতে বিদ'আত।" [একটি সন্দেহ অপনোদন]। যদি বলা হয় যে, অনেক মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত

135 আহমদ, আবু দাউদ, আত্ তিরমিযী

http://islaminonesite.wordpress.com

একটি হাদীসের দ্বারা তারা তাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া বিদ‘আতকে মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করে থাকে, সে হাদীসটি হলঃ

« مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ»

“মুমিনগণ যা উত্তম বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট মন্দ”! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে এর দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন শুদ্ধ হবে, নাকি অশুদ্ধ হবে?

[উত্তর] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ যা আলোচনা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে এর জবাব হল: এই যুক্তি প্রদর্শন বিশুদ্ধ নয়, আর হাদিসটি তাদের বিপক্ষে দলিল, তাদের পক্ষে নয়; কারণ, তা ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত মাওকুফ। হাদীসের অংশবিশেষ, যা আহমদ, বায্যার. তাবারানী, তায়ালাসী ও আবূ নু‘আইম বর্ণনা করেছেন; হাদিসটি এই রকমঃ

« إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه و سلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير

قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيِّئ » . (أخرجه أحمد) .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন; অতঃপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের পর (বাকি) বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন, যারা তাঁর দীনের জন্য লড়াই করবে; সুতরাং মুসলিমগণ যা উত্তম বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।” কোনো সন্দেহ নেই যে, المسلمون শব্দের মধ্যে “ ال " টি সাধারণভাবে গোটা (মুসলিম) জাতিকে বুঝানোর জন্য নয়; কারণ, হাদীসটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী হয়ে যাবে, তিনি বলেছেনঃ

« سَتَفْتَرِقُ أمتي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فرقة ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ » . (أخرجه أبو داود) .

"অচিরেই আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে, আর সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।"। কেননা, উম্মতের প্রতিটি ফিরকা বা দলই মুসলিম, সে তার মাযহাবকে উত্তম মনে করে, সুতরাং যদি সবার ভালো মনে করা ও সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয় তবে তো কোনো দলই জাহান্নামী না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ কোনো জিনিসকে উত্তম মনে করে, আবার তাদের কেউ কেউ সেই জিনিসটিকেই মন্দ মনে করে, এমতাবস্থায় (যদি সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়, তবে) তো উত্তম থেকে মন্দ আলাদা না করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। তাই বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে,

- হাদীসে বর্ণিত, " المسلمون " শব্দের মধ্যকার " ال" টি "عهد" বা পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এখানে পূর্ববর্ণিত বিষয় হচ্ছে, "তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা

http://islaminonesite.wordpress.com

সাহায্যকারী বানালেন”। অর্থাৎ হাদীসে মুসলিমগণ বলে সাহাবীগণকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

- অথবা " المسلمون " শব্দের মধ্যকার " ال " টি দ্বারা "خصائص الجنس" বা মুসলিম শব্দের মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তখন মুসলিম বলে বুঝানো হবে ইসলামের গুণে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ইজতেহাদ করত সক্ষম। এর মাধ্যমে সাধারণগুণ বিশিষ্টকে পূর্ণাঙ্গ গুণবিশিষ্টদের সম্পৃক্ত করা হবে। কারণ, ইঙ্গিত না পাওয়াকালীন সময়ে মুতলাক (مطلق) তথা সার্বজনীন বিষয়টি একটি পরিপূর্ণ শ্রেণীর দিকে স্থানান্তরিত হবে, আর সে শ্রেণি হলো মুজতাহিদ তথা গবেষক শ্রেণী; সুতরাং হাদীসের সঠিক অর্থ হবে: সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ। তাছাড়া “ المسلمون " শব্দের মধ্যকার " ال" টিকে তার প্রকৃত "استغراق" বা এক জাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থে ব্যবহার করাও বৈধ হবে, তখন তার অর্থ হবে: “যা সকল মুসলিম উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর যা সকল মুসলিম মন্দ মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট

মন্দ। আর যে ব্যাপারে মতবিরোধ হবে, সেক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয় হবে সেসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে যাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ঐসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য নয়, যাদের ব্যাপারে মিথ্যবাদিতা ও অনির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

« خَيْرُ القرون قَرْنِى الذي بعثتُ فيه ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يفشو الكذب ».

“আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, যাতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে।”

সুতরাং (যাদের মধ্যে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে) তোমরা তাদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহের উপর আস্থা স্থাপন বা নির্ভর করো না। আর কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবী, তাবে‘য়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ একান্ত অত্যাবশ্যকতার সীমা অতিক্রমকারী বিদ‘আতকে মন্দ ও ঘৃণিতই মনে করতেন, সুতরাং সে-সব বিদ‘আত আল্লাহ ত‘আলার নিকটও মন্দ। বস্তুত আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীর মত, যেখানে তিনি বলেছেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

« لا تجتمع أمتي على الضلالة » .

“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।” এই হাদীসেও ‘উম্মত’ বলতে কেবল ‘আহলুল ইজমা’ (যাদের ইজমা বা ঐকমত্য গ্রহণযোগ্য এমন লোকগণ) উদ্দেশ্য, যিনি হবেন এমন মুজতাহিদ (দ্বীনী গবেষক), যার মধ্যে আসলেই কোনো প্রকার ফাসেকী (পাপাচারিতা) ও বিদ‘আত নেই; কারণ, ফিসক তথা পাপাচার যে তা করে সে ব্যক্তিকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তা ন্যায়পরায়ণতাকে বিদূরিত করে, আর বিদ‘আতপন্থী ব্যক্তি মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে এবং সে সাধারণভাবে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কেননা, সাধারণ উম্মত দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বুঝানো হয়, আর তারা হলেন এমন উম্মত, যাদের পথ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথ, বিদ‘আতপন্থী ও পথভ্রষ্টদের পথ নয়, যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

« أمتي من استن بسنتي »

“আমার উম্মত হল সেই ব্যক্তি, যে আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করে।” তবে (“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর

http://islaminonesite.wordpress.com

ঐক্যবদ্ধ হবে না” হাদীসে) ‘আমার উম্মত’ (أمتي) দ্বারা সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করাও শুদ্ধ বলা যায়, কারণ কখনও কখনও " إضافة" বা সম্বন্ধ পদ "ال" এর মত "استغراق" তথা সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে; সুতরাং অর্থ হবে: “আমার সকল উম্মত মহাকালের কোনো এক কাল বা সময়ে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না, যেমনভিবে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের নবীদের পরে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে”; তখন এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যাতে তিনি বলেছেনঃ

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » . (أخرجه البخاري و مسلم) .

“আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো প্রকার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে, আর তারা তখনও লোকের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান থাকবে।”

বিদআতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন ও দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাঃ

সুতরাং - এ কারনেই বিদআতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন করে রাসূল (ﷺ) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল - আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেনঃ-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .وفي رواية مسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ بخاري ومسلم

অর্থঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী - ২৬৯৭ ও মুসলিম - ১৭১৮)[136]। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) স্বীয় জুমআর খুতবায় বলেছেনঃ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) مسلم.

[136] বুখারী : ২৬৯৭ ও মুসলিম : ১৭১৮

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। (সহীহ মুসলিম : ৮৬৭)।[137]

রাসূল (ﷺ) খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেনঃ-

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِمسلم ونسائي

অর্থঃ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই। নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বাণী। আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। আর মন্দ বিষয়গুলো হলো (দ্বীনের মধ্যে) নবসৃষ্ট আমল বা কাজ। প্রত্যেক নবসৃষ্ট আমলই বিদআত। প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম : ৮৬৭ ও নাসাঈ : ১৫৭৮)[138]।

[137] সহীহ মুসলিম : ৮৬৭

[138] মুসলিম : ৮৬৭ ও নাসাঈ : ১৫৭৮

http://islaminonesite.wordpress.com

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেনঃ-

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا مسلم

অর্থঃ যে ব্যক্তি (মানুষকে) হেদায়াতের দিকে আহবান করবে, সে হেদায়াতের পথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। এতে কারো সাওয়াব কম হবে না। আর যে ব্যক্তি(মানুষকে) পথভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে সে ঐ ভ্রষ্টপথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ২৬৭৪)[139]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (صلى الله عليه وسلم) বলেনঃ-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ مسلم

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল কাজের প্রচলন করল তার জন্য সে কাজের প্রতিদান রয়েছে এবং

---

[139] তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ২৬৭৪

http://islaminonesite.wordpress.com

পরবর্তীতে যারা ঐ ভাল কাজের উপর আমল করল তা থেকেও সে প্রতিদান পাবে, এতে কারো প্রতিদান কম করা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করল তার আমলনামায় সে মন্দ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং পরবর্তীতে উক্ত গুনাহে লিপ্তদের গুনাহও লিখা হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ১০১৭)[140]। ইরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ-

وَعَظَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهاَ الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا :يَارَسُوْلَ اللهِ !كَأَنَّـهَا مَوْعِظَةُ مُوْدِعُ فَأَوْ صِنَا قَالَ:أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تُأَمَّرُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَا جِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ) .أبوداود

অর্থঃ একদা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) আমাদের মাঝে এমন ভাষণ দিলেন যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হল এবং চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হল, তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এ আলোচনা যেন বিদায়ী উপদেশ।

[140] মুসলিম: ১০১৭

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং আমাদের আরো কিছু ওসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহকে ভয় কর, আমীরের কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর; যদিও সে কৃতদাস হয়। আর যে ব্যক্তি আমার পর বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে, সে সময় তোমাদের উচিত হবে আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা যেমনি তোমরা কোন বস্তু মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত ভাবে আঁকড়ে
ধর। **বিদআত** পরিহার কর।

কেননা সকল প্রকার **বিদআতই** পথভ্রষ্টতা। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ: ৪৭০৭ ও তিরমিযী: ২৬৭৬)[141]। হুজাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ-

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْ
تُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَا
لَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا
دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ
ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا
قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُو
نَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِ
مِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ
الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ
عَلَى ذَلِكَ متفق عليه

[141] আবু দাউদ: ৪৭০৭ ও তিরমিযী: ২৬৭৬

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ লোকজন রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর আমি অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম যাতে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

কোন এক সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও কুসংস্কারের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাদের কল্যাণের পথ দেখালেন, এ কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ; অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তার মধ্যে ফ্যাসাদ থাকবে। আমি বললাম, তার মধ্যে ফ্যাসাদ কি? তিনি বললেন, এক দল লোক সুন্নাতের অনুসারী হবে বটে, তবে তা আমার সুন্নাত নয়। তারা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করবে, তাদের মাঝে সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম উভয়টিই পাওয়া যাবে। আমি বললাম, এ কল্যাণের পরও কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; একদল লোক মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তারা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের স্ব-জাতি ও আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! ঐ সময় যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমার জন্য আপনার পরামর্শ কি? তিনি বললেন, তুমি মুসলিম জামাআত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে।

আমি বললাম, যদি তাদের জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে সকল জামাআতই পরিত্যাগ করবে। যদি প্রয়োজন হয় কোন গাছের শিকড় ধরে আমরণ এভাবে পড়ে থাকবে। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী: ৭০৮৪ ও মুসলিম: ১৮৪৭)[142]।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هدي (হাদী) শব্দের অর্থ হল ত্বরীকা ও আদর্শ। আর জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দল প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন, তারা হল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা মানুষকে বিদআতের দিকে আহবান করে। যেমন- খারেজী, কারামতী ও বস্তুবাদী দল। (শরহে মুসলিম: ১২/৪৭৯)[143]। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেনঃ-

142 বুখারী : ৭০৮৪ ও মুসলিম :১৮৪৭

143 শরহে মুসলিম: ১২/৪৭৯

http://islaminonesite.wordpress.com

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ [هوحبل الله ا لمتين من أتبعه كان على الـهدى ومن تركه كان على الضلالة
فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ مسلم

অর্থ: হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যখনই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যুদূত আসবে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। আর আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার একটি হল আল্লাহর কিতাব (অপরটি আমার সুন্নাত), যাতে রয়েছে হেদায়াত ও নূর। এটা আল্লাহর সুদৃঢ় রশি। যারাই এ কিতাব মেনে চলবে তারাই হেদায়াত পাবে। আর যারা তা ছেড়ে দেবে তারা পথভ্রষ্ট হবে। তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ২৪০৮)[144]।

এ হাদীসে আল্লাহর কিতাব মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেনঃ-

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ
مسلم

[144] মুসলিম: ২৪০৮

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ শেষ জমানায় এমন কিছু মিথ্যাবাদী প্রতারকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে; যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ কোন দিন শোননি। অতএব তোমরা তাদের হতে দূরে থাক যাতে তারা তোমাদের গোমরাহী ও ফিতনায় ফেলতে না পারে। (তথ্যসূত্রঃ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: ৬ ও ৭)[145]

দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাঃ ইবনুল হাম্মাম বলেনঃ যখন কোনো ইবাদতে ওয়াজিব ও বিদ‘আতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন সতর্কতার খাতিয়ে তা করা হবে; কিন্তু যদি বিদ‘আত ও সুন্নাতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন তা পরিত্যাগ করবে; কারণ, বিদ‘আত ত্যাগ করা আবশ্যক, আর সুন্নাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

অবশ্য ‘আল-খোলাসা’ গ্রন্থকারের একটি মাস‘আলা প্রমাণ করে যে, ওয়াজিব তরক (ত্যাগ) করার চেয়ে বিদ‘আত অনেক বেশি ক্ষতিকর, যেমন তিনি বলেন: যখন কেউ তার সালাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কি তা সালাত আদায় করেছে, নাকি আদায় করেনি? এমতাবস্থায় সে যদি ওয়াক্তের মধ্যে থাকে, তাহলে পুনরায় তা আদায় করে নেবে;

[145] মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: ৬ ও ৭

http://islaminonesite.wordpress.com

আর যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে সন্দেহ করে, তাহলে কিছুই করতে হবে না। তবে যদি আসরের সালাত (পড়েছে কি পড়েনি) এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে (যখন দ্বিতীয়বার তা আদায় করবে তখন) প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে পাঠ করবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে পাঠ করবে না; কারণ, ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাকআতকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে নফল সালাতে প্রতি দু'রাকাতেই কিরাআত মেলাতে হয়, তাই যদি পরপর দু' রাকাআতে কিরাআত পড়া হয়, তখন কোনো কারণে পূর্বে সে যদি ফরয সালাত আসলেই পড়ে থাকে তবে তো সেটা নফল হিসেবে ধর্তব্য হয়ে যাবে, অথচ আসরের পরে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ, তাই তাকে পরপর প্রতি রাকআতে সূরা মিলিয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে দ্বিতীয়বার পড়া সালাতটি কোনো ক্রমেই ফরয না হয়ে নফল সালাত হিসেবে ধর্তব্য না হয়। কারণ যদি আসরের পরে নফল সালাত আদায় করা হয় সেটি হবে বিদ'আত, যা অপছন্দনীয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই।কেননা, বিদ‘আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আর সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেনঃ “ইবলিসের নিকট সকল পাপের চেয়ে বিদ‘আতই সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কারণ, পাপ থেকে তাওবা করা হয়, আর বিদ‘আত থেকে তাওবা করা হয় না।”

বিদ‘আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থানঃ আর বিদ‘আতের এই অর্থকেই আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রাঃ) বুঝাতে চেয়েছেন, যখন তাঁকে এমন এক দলের ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো, যারা মাগরিবের সালাতের পর বসে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলতে থাকে: তোমরা এতবার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়, তোমরা এতবার ‘সুবহানাল্লাহ’ পড় এবং তোমরা এতবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়। অতঃপর শ্রোতারা তা করতে থাকে। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: “আমি আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, ঐ আল্লাহর কসম,

যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, অবশ্যই তোমরা অন্ধকারপূর্ণ বিদ‘আত নিয়ে এসেছ অথবা তোমরা জ্ঞানের দিক থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ছাড়িয়ে গেছ।” অর্থাৎ তোমরা যা নিয়ে এসেছ, হয় তা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ‘আত, নতুবা তোমরা সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডের সাথে সেটা যুক্ত করছ যা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে; তাদের মনোযোগের অভাবে অথবা তাঁদের অলসতার কারণে, ফলে ইবাদতের নিত্য-নতুন পদ্ধতি জানার মাধ্যমে তোমরা সাহাবীগণকে পরাজিত করছ; আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু দ্বিতীয়টি অগ্রহণযোগ্য, যথাযথ নয়, সেহেতু প্রথমটিই সাব্যস্ত হলো, অর্থাৎ তোমাদের এ কর্মকাণ্ড অন্ধকারপূর্ণ বিদ‘আত হওয়া। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এর উপর ভিত্তি করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তা বলা যাবে, যে নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদতের মধ্যে এমন ধরন বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে, যা সাহাবীদের যুগে ছিল না। কারণ, সে যদি বিদ‘আতী কাজকে ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করে তাকে ‘উত্তম বিদ‘আত’ (বিদআতে হাসানাহ) বলে গ্রহণ করে, তাহলে সে ইবাদতসমূহের মধ্যে অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিদ‘আত বলতে কিছু পাবে না; অথচ ইবাদতের মধ্যে অপছন্দনীয় বিদ‘আতের অস্তিত্ব অবশ্যই রয়েছে,

http://islaminonesite.wordpress.com

যেমনটি আলেমগণ স্পষ্টভাবে তাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

উপসংহারঃ উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম অনুযায়ী বলা যায় যে, হুকুমদাতা, বিধানদাতা তথা আল্লাহর বিধান তথা ইসলাম বিধান মানতে হবে এবং এর কোন বিকল্প পথ নেই আর তা না হলে মুসলিম জাতিকে বিদ'আত তথা কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা কঠিন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (صلى الله عليه وسلم) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী তথা শিরকী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (صلى الله عليه وسلم) ও তাঁর হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করা।

আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ তথা কুসংস্কার মূলক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য।কারন বিদ'আত সৃষ্টিকারীর প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং সবলোকের অভিশাপ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর হাদীস প্রনিধানযোগ্য। আছেম (রাঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) কি মদীনকে হেরেম আখ্যা দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যা, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ স্থানের কোন গাছ কাটা যাবে না। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এখানে কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ'আত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং লোক সকলের অভিশাপ হবে। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী ও মুসলিম – আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং – ৮৬৫)[146]। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, - বিদ'আতী আমল ও শিরক মুক্ত আমল পরিহার করা এবং মৃত সুন্নাত জীবিত করা। কারন মৃত সুন্নাত জীবিত করার মর্যাদা অনেক বেশি। বিস্তারিতভঅবে বলা যায় যে, যখন কোন সূন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার উপর মানুষকে উদ্ভুদ্ধ করা এবং তার উপর আমল করার ফযীলত অনেক। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) তাই বলেনঃ

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ
مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا،
وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

"যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমল করে, সেও আমল কারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদআতের উদ্ভাবন

[146] বুখারী ও মুসলিম – আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং – ৮৬৫

http://islaminonesite.wordpress.com

করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না”।যেমনঃ সমাজে রাফউল ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন বলা এসব সহীহ হাদীসগুলো প্রায় মাযহাবপন্থীদের অত্যাচারে প্রায় বাতিল পর্যায়ে। তাই আসুন, আমরা বিদ'আতী তথা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার প্রচেষ্টায় এসব বিলুপ্ত প্রায় সুন্নতী আমলগুলো জিন্দা করি এবং সওয়াব ও নেকী অর্জন করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সমাপ্ত)

http://islaminonesite.wordpress.com